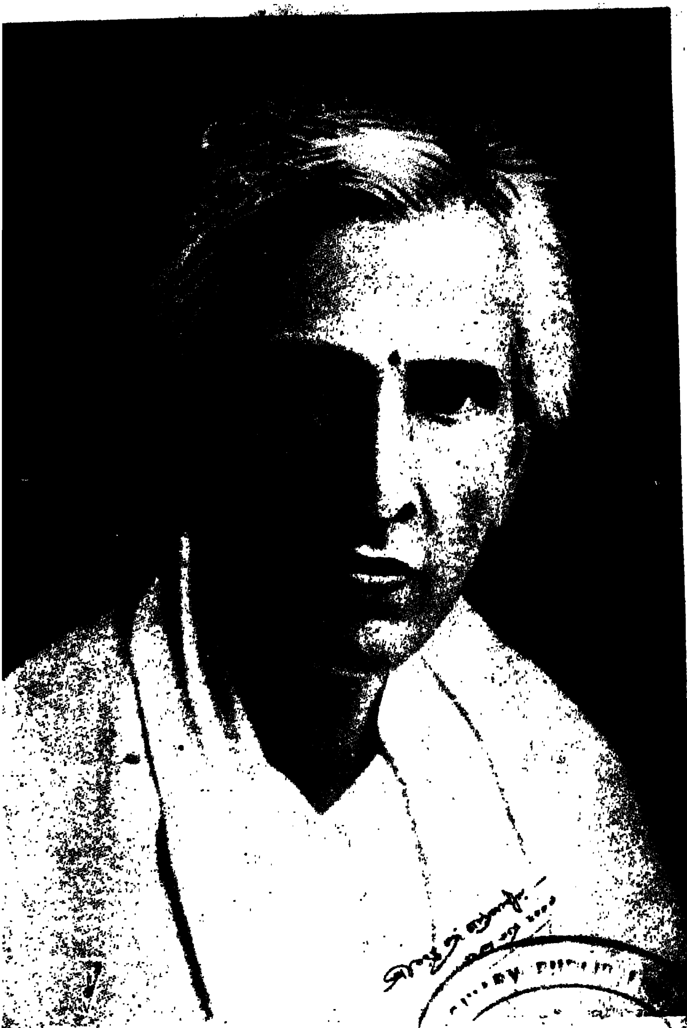


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাশীনাথ

১

রাত্রি চারটার সময় স্নানান্তে পূজাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া টিকিটি বেশ উঁচু করিয়া বাঁধিয়া কাশীনাথ যখন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের টোল-ঘরের বারান্দায় বসিয়া দর্শনের সূত্র ও ভাষ্য গুন গুন স্বরে কণ্ঠস্থ করিত তখন তাহার বাহ্য-জগতের কথা আর মনে থাকিত না। প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘাকৃতি কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শন-শাস্ত্র-গহনে প্রবেশ করিয়া আপনাকে দিশেহারা করিয়া ফেলিত। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া কত লোক কত কথা বলিত। কেহ কহিত, সে তাহার পিতার ন্যায় পণ্ডিত হইবে। কেহ বলিত, পিতার ন্যায় পড়িয়া পড়িয়া হয় ত বা পাগল হইয়া যাইবে। যাঁহারা তাহার বাতুল হইবার আশঙ্কা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশীনাথের মাতুল একজন। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন, বাপু, তুমি গরীবের ছেলে, তোমার অত পড়িয়া কি হইবে? যাহা শিখিয়াছ, তাহাতেই কোনরূপে এক মুষ্টি আতপ-তণ্ডুল, একখানা গামছা ও দুটা তৈজসপত্রের স্বচ্ছন্দে জোগাড় হইবে। অত পড়িয়া কি শেষে স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া মাথা নাড়িতে থাকিবে? এখন যাহা আশা আছে তখন তাহাও থাকিবে না। এ সব কথা কাশীনাথের এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিত, অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত।

বাতুল হইয়া যাইবার আশঙ্কায় মাতুল তিরস্কার করিতেন; সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই দেখে না বলিয়া মাতুলানী তাড়না করিতেন; ব্যাকরণ-

কাশীনাথ

১

রাত্রি চারটার সময় স্নানান্তে পূজাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া টিকিটি বেশ উঁচু করিয়া বাঁধিয়া কাশীনাথ যখন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের টোল-ঘরের বারান্দায় বসিয়া দর্শনের সূত্র ও ভাষ্য গুন গুন স্বরে কণ্ঠস্থ করিত তখন তাহার বাহ্য-জগতের কথা আর মনে থাকিত না। প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘাকৃতি কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শন-শাস্ত্র-গহনে প্রবেশ করিয়া আপনাকে দিশেহারা করিয়া ফেলিত। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া কত লোক কত কথা বলিত। কেহ কহিত, সে তাহার পিতার ন্যায় পণ্ডিত হইবে। কেহ বলিত, পিতার ন্যায় পড়িয়া পড়িয়া হয় ত বা পাগল হইয়া যাইবে। যাঁহারা তাহার বাতুল হইবার আশঙ্কা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশীনাথের মাতুল একজন। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন, বাপু, তুমি গরীবের ছেলে, তোমার অত পড়িয়া কি হইবে? যাহা শিখিয়াছ, তাহাতেই কোনরূপে এক মুষ্টি আতপ-তণ্ডুল, একখানা গামছা ও দুটা তৈজসপত্রের স্বচ্ছন্দে জোগাড় হইবে। অত পড়িয়া কি শেষে স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া মাথা নাড়িতে থাকিবে? এখন যাহা আশা আছে তখন তাহাও থাকিবে না। এ সব কথা কাশীনাথের এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিত, অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত।

বাতুল হইয়া যাইবার আশঙ্কায় মাতুল তিরস্কার করিতেন; সংসারের কাজকর্ম্ম কিছুই দেখে না বলিয়া মাতুলানী তাড়না করিতেন; ব্যাকরণ-

সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ মাতুলপুত্রেরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত; কিন্তু কাশীনাথ হয় এ সকল অকাতরে সহ্য করিত; নয় এ সকল কথার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিত না।

যাহা হৌক ফল একই দাঁড়াইয়াছিল; সে নিত্য যাহা করিত, নিত্য তাহাই করিত। সন্ধ্যার সময় কখনও মাঠে মাঠে আপনার মনে ঘুরিয়া বেড়াইত; কখনও নদীতীরের একটা পুরাতন অশ্বত্থ-বৃক্ষের শিকড়ের উপর বসিয়া, অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমাভা কেমন করিয়া একটির পর একটি করিয়া আকাশের গায় মিলাইয়া যায়, দেখিতে থাকিত; কখনও গ্রামের জমীদার-বাটীর শিবমন্দিরে শিবের আরতি অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে অনুভব করিতে থাকিত, কখনও বা এ সকল কিছুই করিত না, শুধু মাতুলের চণ্ডীমণ্ডপের অন্ধকার নিভৃত কোণে কম্বলের আসন পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

যেন জগতে তাহার কর্ম্ম নাই, উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল; এখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে—এই ছয় বৎসর কাল মাতুলভবনে এইরূপে কাটিয়া যাইতেছে। সে এখন কি করিতেছে, পরে কি করিবে, আগে কি করিয়াছিল, এখন কি করা প্রয়োজন ও উচিত, এ সব কথা তাহার মনে আদৌ স্থান পাইত না। যেন তাহার এমনই করিয়া চিরদিন কাটিবে; যেন এমনই ভাবে চিরদিন মামার বাড়ীর দুবেলা দুমুটো ভাত ও তিরস্কার খাইতে পাইবে। যেন তাহাকে আর কোথাও যাইতে হইবে না—আর কিছুই করিতে হইবে না। তাহার সেই নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার কোণটি যেন চিরদিন তাহারই অধিকারে থাকিবে, কেহ কখনও সেটা দখল করিতে আসিবে না, কিংবা সরিয়া অন্যত্র বসিতে বলিবে না। পাড়ার কোনও লোক দয়া করিয়া কখনও ডাকিয়া বলিত, কাশীনাথ, এমন করিয়া কখনও কাহারও চলে

নাই, তোমারও চলিবে না ; যাহা হৌক, একটা কিছু কর। কাশীনাথ জবাব দিত না ; শুধু মনে মনে ভাবিত, কি করিতেছি, এবং কি বা আমাকে করিতে হইবে ? এমনি করিয়া কাশীনাথের দিন কাটিতেছিল।

২

ও-গ্রামের জমীদারের নাম প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রিয়নাথবাবু মহাকুলীন ও অতিশয় ধনবান। যখন দেখিলেন, এক কুলের খাতিরে এত বড়লোক হইয়াও সর্ব্বরূপগুণযুক্ত পাত্র বহু অনুসন্ধান করিয়াও মিলিল না, তখন তিনি কৌলীন্য-প্রথার উপর একেবারে চটিয়া গেলেন। গৃহিণীকে এ কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, আমার এক বই মেয়ে নেই, আমার আর কুল নিয়ে কি হবে ?

গ্রামেই গুরুদেবের বাটী ; তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, হরি, হরি—এও কি কখন সম্ভব ? তোমার অর্থের ভাবনা নাই, কোন দরিদ্র কুলীন সন্তানকে কন্যা দান করিয়া, জামাতা ও কন্যা নিজের বাটীতেই রাখিয়া দাও—ইহা দেখিতেও ভাল হইবে, শুনিতেও ভাল হইবে, এত বড় বংশ, এত বড় কুল, ইহার মর্য্যাদা কি ছোট করিতে আছে ! প্রিয়বাবু বাড়ীতে আসিয়া এ কথা জানাইলেন ; গৃহিণী সাহ্লাদে মত দিয়া বলিলেন, তাই কর। যে কটা দিন বাঁচি, কমলা আমার কাছেই থাক্।

তাহাই হইল। দরিদ্র দেখিয়া বিবাহ দিয়া নিজের কাছেই রাখিবেন বলিয়া, প্রিয়বাবু এক দিবস মধুসূদন মুখুয্যে মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন শর্ম্মা তখন যজমান-বাটীতে নিত্যপূজা করিতে যাইতেছিলেন ; সহসা এত বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, কোথায় বসিতে দিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না।

প্রিয়বাবু বুঝিলেন, মধুসূদন কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন ; হাসিয়া বলিলেন, মশায়ের নিকট কিছু প্রয়োজন আছে। চলুন ভিতরে গিয়ে বসি।

আজ্ঞে হাঁ—চলুন ; কিন্তু—তা—

না—তা কিছুই নয়—চলুন, বসে সকল কথা বলছি।

তখন দুইজন চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। প্রিয়বাবু বলিলেন, আপনার ভাগিনেয়টি কোথায় ?

আর কোথায় ! ভট্টাচার্য্যমশায়ের টোলে পড়ছে।

একবার ডেকে পাঠান।

পাঠাচ্ছি; কোনও প্রয়োজন আছে কি ?

বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, সে অকর্ম্মণ্য ছোঁড়াটার সহিত এত বড় সম্ভ্রান্ত লোকের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে। বরং একটু ভীত হইয়া কহিলেন, কিছু করেছে কি ?

কি করবে ?

তবে ?

প্রিয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, তাকে নিজের জামাতা করব মনে করেছি, এবং সেই সূত্রে আপনি আমার বৈবাহিক। বলিয়া প্রিয়বাবু জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। যে কথা মনে হওয়ায় তাঁহার হাসি পাইয়াছিল, মধুসূদন তাহা জানিতে পারিলে বোধ হয় আর কথাই কহিতেন না। ভট্টাচার্য্য বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কাকে—কাশীনাথকে ?

হাঁ।

কেন ?

অত বড় কুলীনসন্তান আমি আর সন্ধান করে পেলাম না। আপনার এ বিবাহে অমত আছে কি?

অমত! এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা—কিন্তু সে যে পাগল!

পাগল? কই, এ কথা ত কখন শুনি নাই?

তার পিতা পাগল ছিল।

কাশীনাথের পিতাকে প্রিয়বাবু বিলক্ষণ চিনিতেন; এবং ইহাও জানিতেন, তাঁহাকে অনেকেই পাগল বলিত। প্রিয়বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, ছেলেটির নাম কি?

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাকে ডেকে পাঠান—আমি একবার দেখব।

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। যে ডাকিতে গেল, সে তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র। সে গিয়া ডাকিল, কাশীদাদা! কাশী-দাদা উত্তর দিল না। আবার ডাকিল, কাশীদাদা! এবার কাশীনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, কি?

তোমাকে বাবা ডাকছেন।

কেন?

তা জানি নে! ও গাঁয়ের জমীদারবাবু এসেছেন, তিনিই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কাশীনাথ ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিয়া বাটী আসিয়া যেখানে প্রিয়বাবু ও তাহার মাতুল মহাশয় বসিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপবেশন করিল। প্রিয়বাবু তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, কাশীনাথ! কোথায় ছিলে?

ভট্টাচার্য্যমশায়ের টোলে পড়ছিলাম।

ব্যাকরণ পড়েছ?

কাশীনাথ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে পড়িয়াছে।

সাহিত্য পড়েছ ?

সামান্যই পড়েছি ?

এখন কি পড়ছ ?

সাঙ্খ্য-দর্শন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আচ্ছা যাও, পড় গে।

কাশীনাথ চলিয়া গেল। তাহাকে কেন ডাকাইয়া আনা হইল, কেন যাইতে বলা হইল, তাহা সে কিছুই বুঝিল না। টোলে আসিয়া পুনরায় পুঁথি খুলিয়া বসিল। সে চলিয়া গেলে প্রিয়বাবু বলিলেন, কি পাগলের না কিসের কথা বলছিলেন ?

মধুসূদন কহিলেন, না, পাগল ঠিক নয়; কিন্তু ঐ একরকম, তাই কেউ কেউ ওকে পাগল বলে।

কি রকম ?

সর্ব্বদা পুঁথি নিয়ে বসে থাকে, না হয় আপন মনে ঘুরে বেড়ায়—কোনও কথায় বা কোনও কাজে থাকে না—এই রকম।

আর কিছু করে ?

হয় ত কখনও বা একটা অন্ধকার ঘরের কোণে একা চুপ করে বসে থাকে।

প্রিয়বাবু হাসিয়া বলিলেন, আর কিছু ?

এ হাসির অর্থ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য যেন কতক বুঝিতে পারিলেন। অল্প অপ্রতিভভাবে বলিলেন, না, আর কিছু নয়।

তবে বাটীর ভেতর একবার জিজ্ঞেস করে আসুন। তাঁদের যদি মত হয় ত এই মাসের মধ্যে বিবাহ দিয়ে ফেলি।

ভিতরে আসিয়া মধুসূদন গৃহিণীকে এ কথা জানাইলে—তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বিস্ময়ের মাত্রা কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, বলিলেন,

কাশীর সঙ্গে প্রিয়বাবুর মেয়ের বিয়ে? তুমি কি পাগল হলে না কি?

এতে পাগলের কথা আর কি আছে?

নাই কি?

কাশীনাথ কত বড় কুলীনের ছেলে মনে আছে কি?

গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার হরির সঙ্গে হয় না?

দুইজনেই জানিতেন, তাহা হয় না। কর্ত্তাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মত কি?

গৃহিণী বিষণ্ণভাবে বলিলেন, মত আর কি—হয় হোক।

কর্ত্তা বাহিরে আসিয়া কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণীর এতে আনন্দের সীমা নাই। উনিই কাশীর জননীস্থানীয়া—যখন কাশীনাথ দু বছরের, তখন আমার ভগিনীর মৃত্যু হয়। সেই অবধি এক রকম উনিই মানুষ করেছেন। তারপর যখন স্বর্গীয় বাঁড়ুয্যেমশায়ের পরলোক হয়, তদবধি ত এইখানেই আছে।

প্রিয়বাবু কহিলেন, সমস্তই আমি জানি। তবে আজই সমস্ত স্থির করে ফেলুন।

কি স্থির করতে হবে? আপনার যেদিন সুবিধা হবে, সেই দিনই আমি আশীর্ব্বাদ করে আসব।

সে কথা নয়; কৌলীন্যের মর্য্যাদাটা?

সে বিষয়ে আমি আর কি স্থির করব? মশায় যা অনুমতি করবেন তাই হবে; তবে আপনার ভাবী জামাতার মাতুলানী—তিনিই মাতৃস্থানীয়া—তাঁর কথা একবার শোনা আবশ্যক।

অবশ্য, অবশ্য! তাই ত বলছিলাম।

পরে মাতুলানীর মত লইয়া, প্রিয়বাবুর স্ব-ইচ্ছায় স্থির হইয়া গেল যে,

জননীস্থানীয়া ভট্টাচার্য্যগৃহিণী এক সহস্র নগদ না লইয়া কাশীনাথের কিছুতেই বিবাহ দিবেন না। তাহাই হইল; প্রিয়নাথবাবু ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

৩

পূর্ব্বে যাহাই হৌক, যখন দেখিল, সে রীতিমত স্থায়ীরূপ ঘরজামাই হইয়া পড়িয়াছে, তখন কাশীনাথের মনে আর সুখ রহিল না। এখন সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে আর যাইতে পারে না; যথা ইচ্ছা তথায় দাঁড়াইতে পায় না; যাহার তাহার সহিত কথা কহিতে পায় না; সব জিনিষ হইতে তাহাকে যেন পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। সে যেখানে যাইতে চাহে, সেইখানেই হয় ত তাহার শ্বশুরের অমত হয়; না হয় শাশুড়ীঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠেন, কি,আমার জামাই অমুকের মাটী মাড়াইবে? জামাই অমনই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। কেন এমন হইল, কেন তাহাকে এমন করিয়া রাখা হইতেছে, এমন করিয়া কাহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, কাশীনাথ তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারে না। সময়ে সময়ে মনকে প্রবোধ দেয়, আমি কি আর যে সে লোক আছি যে, যা তা করিব? কিন্তু ভিতরটা কাঁদিয়া বলে, স্বস্তি পাই না—স্বস্তি পাই না। সে কণ্টকময় বনে স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, এখন স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। অসীম উদ্দাম সাগরে ভাসিয়া যাইতেছিল,এখন তাহাকে একটা চতুর্দ্দিকে-বাঁধা পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সাগরে যে সে বড় সুখে ভাসিয়া যাইতেছিল,তাহা নহে—সেখানে ঝড়-বৃষ্টি ও তরঙ্গে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু এ নির্ম্মল সরোবর তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এক এক সময়ে মনে হইত,

যেন এক কটাহ উষ্ণ জলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করিয়া তাহার দেহটাকে কিনিয়া লইয়াছে; সেটা যেন আর তাহার নিজের নাই। মাথায় সে টিকি নাই, কণ্ঠে সে তুলসীর মালা নাই, সে খালি পা নাই, সে খালি গা নাই, সে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের টোল নাই, নদীর ধারের অশ্বত্থ-বৃক্ষ নাই, চণ্ডীমণ্ডপের কোণ নাই—কিছুই নাই।

সে নব-জন্ম লাভ করিয়া পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বস্তু ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। কিংবা তাহার দেহ আর মন যেন বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় মনটা যখন নদীর ধারের অশ্বত্থ-বৃক্ষমূলে কি মাঠের ভিতর কৃষকদিগের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে, দেহখানা তখন হয় ত চমৎকার বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া গাড়ী চড়িয়া বেড়াইয়া আসে। মনটা যখন কোমরে গামছা বাঁধিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, দেহটা হয় ত তখন জলচৌকির উপর বসিয়া ভৃত্যহস্তে সাবান-জলে পরিষ্কৃত হইতে থাকে। এইরূপে একটা কাশীনাথ সর্ব্বদা দুইটা কাজ করিয়া বেড়ায় অথচ কোনটাই তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, সম্পূর্ণও হয় না।

কতদিন এইরূপে কাটিল। এক মাস দুই মাস করিয়া শ্বশুরালয়ে তাহার এক বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম কয়েকমাস তাহার মন্দ অতিবাহিত হয় নাই। আমোদ উৎসাহে, বিশেষ একটা নূতনত্বের মোহে সে নিজের অবস্থার দোষগুণ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার সময় পায় নাই; যখন পাইল, তখন দিন দিন শুকাইতে লাগিল। অপর কেহ এ কথা না বুঝিতে পারিলেও কমলা বুঝিল; তাহার চক্ষু স্বামীর অবস্থা ধরিয়া ফেলিল। এক দিন সে বলিল, তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ কেন?

কে বল্‌লে?

আমার চোখ বল্‌লে।

ভুল বলছে।

কমলা ধরিয়া বসিল, কি হয়েছে আমাকে বলবে না?

কিছুই ত হয়নি!

হয়েছে।

হয়নি।

নিশ্চয় হয়েছে। আমার মন সব জান্‌তে পারে।

কাশীনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল, তুমি বড় বিরক্ত কর, আমি এখান থেকে যাই।

কাশীনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া কমলা হাত ধরিল; কাতর হইয়া কহিল, যেও না—আমি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। কাশীনাথ একবার বসিল, কিন্তু পরক্ষণেই উঠিয়া চলিয়া গেল। কমলা আর বসিতে বলিল না, কিন্তু চলিয়া গেলে বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাশীনাথ বাহিরে আসিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার উপর কাহারও চক্ষু নাই। তখন ধীরে ধীরে ফটক পার হইয়া রাস্তা বাহিয়া চলিতে লাগিল। অনেক দূর গিয়া দেখিতে পাইল, একজন দরওয়ান তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। কাশীনাথ বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া কহিল, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

সে সেলাম করিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে যেতে হবে না—তুই ফিরে যা।

সন্ধ্যার সময় একা বেড়াবেন?

কোন উত্তর না দিয়া কাশীনাথ চলিতে লাগিল। দরওয়ান বেচারী কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া একটু দাঁড়াইয়া নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া স্থির করিল যাওয়াই উচিত। কাশীনাথ তাহা কিছুই লক্ষ্য করিল না। আপন মনে চলিতে চলিতে মামার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিতরে

প্রবেশ করিয়া শূন্যমনে একটা ঘরের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, হরিবাবু বেড়াইতে যাইতেছিলেন, তিনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়াছে, বারান্দায় অল্প অন্ধকারও হইয়াছে; সুতরাং চিনিতে পারিলেন না। নিকটে আসিয়া বলিলেন, কে ও? কাশীনাথ বলিল, আমি। হরিবাবু অতিশয় বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, কে ও, জামাইবাবু নাকি? কাশীনাথ মৌন হইয়া রহিল। তখন হরিবাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, ও মা, দেখে যাও, জমীদারদের জামাইবাবু এসেছেন—বসবার জায়গাও কেউ দেয় নি। হরির মা বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, তাই ত! দুঃখী মামিকে মনে পড়েছে বাবা? কাশীনাথ বরাবর চুপ করিয়াই রহিল। তখন মাতুলানী আপনার কন্যা বিন্দুবাসিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, বিন্দু, একবার এ দিকে আয় মা—তোর কাশীদাদা এসেছেন, একটা বসবার আসন দে, আমি ততক্ষণ আহ্নিকটা সেরে আসি। বিন্দুবাসিনী মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা। গৃহস্থঘরের বৌ বলিয়া বাপের বাড়ীতে বড় একটা আসিতে পারে না। আজ মাস-খানেক হইল এখানে আসিয়াছে। আসিয়া অবধি তাহার কাশীদাদার সহিত দেখা হয় নাই। কাশীদাদাকে সে বড় ভালবাসিত তাই নাম শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই, শুধু একজন বাবু অন্ধকারে বারান্দায় বসিয়া আছে। এরূপ কাশীদাদা পূর্ব্বে সে দেখে নাই। বড়লোকের জামাতা হইয়াছে, এবং বাবু হইয়াছে দেখিয়া তাহার হাসি আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া অন্ধকারেও দাদার মুখখানা এত ম্লান বোধ হইল যে, সে আর হাসিতে পারিল না। কাশীনাথের মুখ ম্লান হইতে পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই, বিশেষ বিন্দু—বাড়ীর মধ্যে সেই কেবল কাশীনাথকে কিঞ্চিৎ চিনিতে পারিয়াছিল। সে নিকটে আসিয়া সস্নেহে হাত ধরিয়া বলিল, কাশীদাদা!

এখানে একলা কেন? চল, আমার ঘরে গিয়ে বলবে চল! কাশীনাথ বিন্দুর ঘরে আসিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিল।

বিন্দু কহিল, কাশীদাদা, আমি কতদিন এসেছি, তুমি এক দিনও দেখ্‌তে আসনি কেন?

আস্‌তে পারিনি বোন।

কেন আস্‌তে পারনি?

কাশীনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আস্‌তে দেয় না।

আস্‌তে দেয় না? সে কি?

কাশীনাথ অন্যমনস্কভাবে কহিল, ঐ রকম।

বিন্দু দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে দেয় না?

না, দেয় না। আমি কোথাও গেলে শ্বশুরমশায়ের অপমান বোধ হয়। বিন্দু বুঝিল, এ সকল কথা বলিতে কাশীনাথের ক্লেশ বোধ হইতেছে, তাই অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, দাদা, তোমার বৌ দেখালে না?

কাশীনাথ মৌন হইয়া রহিল।

বিন্দু আবার বলিল, কেমন বৌ হয়েচে?

ভাল।

তবে আমি একদিন গিয়ে দেখে আস্‌ব। কাশীনাথ মুখ তুলিয়া বিন্দুর মুখের পানে চাহিল; ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যেও।

এমন সময়ে গুম্ গুম্ শব্দে একখানি গাড়ী আসিয়া সদরে থামিল। বিন্দু বলিল, ঐ বুঝি তোমার গাড়ী এল।

বোধ হয়। যাবার সময় জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবে?

কোথায়?

বৌ দেখ্‌তে। বিন্দু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার যবে সুবিধা হবে, সেইদিন এসে নিয়ে যেও।

কাল আস্‌ব ?

এসো।

পরদিন কাশীনাথ গাড়ী লইয়া নিজে আসিল। বিন্দুর যাইবার সময় কোথা হইতে হরিবাবু আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিবার সময় গাড়ী দেখিয়া কাশীনাথের আগমন কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন। ভিতরে আসিয়া বিন্দু কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করায়, মা বলিলেন, বৌমাকে একবার দেখ্‌তে যাচ্ছে।

কোন্‌ বৌমাকে ? জমীদারের মেয়েকে ? গৃহিণী কথা কহিলেন না। তখন হরিবাবু মহাগম্ভীরভাবে কহিলেন, বিন্দু যদি ওখানে যায় তা হ'লে এ জন্মে আমি আর ওর মুখ দেখ্‌ব না। মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি রে! ভাইয়ের বৌকে দেখতে যাবে তাতে দোষ কি ?

দোষের কথা তোমাকে বুঝিয়ে দেবার সময় নাই। বিন্দু যদি আমার কথা না শোনে, তা হ'লে এ বাড়ীতে সে যেন আর না আসে!

হরিদাদা কি প্রকৃতির মানুষ, বিন্দুর তাহা অবিদিত ছিল না। সে নিঃশব্দে ঘরে গিয়া কাপড় চোপড় খুলিয়া রাখিল। কাশীনাথ দাঁড়াইয়া সব দেখিল; তাহার পর ম্লানমুখে গাড়ীতে আসিয়া বসিল। সন্ধ্যার সময় কমলা জিজ্ঞাসা করিল, কৈ, ঠাকুরঝি এলেন না ?

কাশীনাথ কাতরভাবে বলিল, তাঁরা পাঠালেন না।

কেন ?

তা জানি না। বোধ হয়, এখানে পাঠাতে তাঁদের লজ্জা বোধ হয়। কথাগুলি কমলার বুকের ভিতর গিয়া বিঁধিয়া রহিল।

৪

জমিদার প্রিয়বাবুর একটিমাত্র সন্তান কমলা। প্রিয়বাবু আরও দুইটি সংসার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সন্তানাদি হয় নাই। সে সমস্ত গত হইলে, মনের দুঃখে বৃদ্ধাবস্থায় আর একটি সংসার পাতাইলেন—তাহার ফল একটিমাত্র কন্যারত্ন। নিঃসন্তানের সন্তান হইলে পুত্র-কন্যার ভেদ রাখে না; তাই কমলা কর্ত্তার উপর কর্ত্তা, গৃহিণীর উপরও গৃহিণী। তাহার কথা কাটে, কিংবা অমান্য করে, বাড়ীর মধ্যে এ ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কমলা ধনবতী, বিদ্যাবতী, রূপবতী, গুণবতী—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী; তথাপি এক জনকে কিছুতেই সে আয়ত্ত করিতে পারিল না; যাহাকে পারিল না, সে তাহার স্বামী। কমলা অনেক করিয়া দেখিয়াছে। রাগ করিয়া দুঃখ করিয়া দেখিয়াছে, মান করিয়া অভিমান করিয়া দেখিয়াছে, আদর যত্ন করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মন দখল করিতে পারে নাই। দখল করা দূরে থাকুক তাহার বোধ হয় কাছে যাইতেও পারে নাই। একটা দরিদ্র লোক যে কত বড় মন লইয়া তাহার স্বামী হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে কিছুতেই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য দুইবেলা কমলা প্রার্থনা করিত, ঠাকুর ওঁর মনটি আমাকে ধরিয়া দাও। সময়ে সময়ে মনে করিত, বোধ হয় মনই নাই, তাই ধরিতে পারি না। কমলার নিকট তাহার স্বামী একটি জটিল রহস্য বলিয়া মনে হইত; যত দিন যাইতে লাগিল, উদ্ভেদের পন্থা পাওয়া দূরে যাক, তত অধিক জটিল বলিয়া মনে হইত। কখনও সে ভাবিত, স্বামীর এত অধিক ভালবাসা বোধ হয় কোনও স্ত্রী কখনও লাভ করে নাই; কখনও মনে হইত এত দারুণ উপেক্ষাও বোধ হয় কখন কাহাকেও ভোগ করিতে হয় নাই। তথাপি কমলার দিন কাটিতে লাগিল; শুধু কাটে না

কাশীনাথের ; পুঁথিতেও আর মন বসে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও বিরক্তি বোধ হয়, কথা-বার্ত্তা আমোদ-আহ্লাদেও প্রবৃত্তি হয় না। অমন হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর কৃশ হইতে লাগিল, অমন গৌরবর্ণ কালো হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া কমলা কপালে করাঘাত করিল। পূর্ব্বে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবে না ; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আর রক্ষা করা চলিল না। স্বামী আসিলে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কাশীনাথ বিব্রত হইয়া কমলার হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল না।

কি হয়েছে, কাঁদছ কেন ? কমলা কথা কহিল না। বহুক্ষণ কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া কহিল, তুমি আমাকে একেবারে মেরে ফেল ; এমন একটু একটু ক'রে পুড়িও না। কাশীনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইল—কেন, করেছি কি ?

তা কি তুমি জান না ?

কৈ, কিছুই না।

আর যা ইচ্ছে কর, কিন্তু আমার দাঁড়াবার একটু স্থান রেখো।

এবার কাশীনাথ কমলাকে তুলিতে পারিল, কাছে বসাইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে, বেশ করে বুঝিয়ে বল দেখি।

তুমি রোজ রোজ এমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন ?

আমার শরীর কি বড় মন্দ হয়েছে ? কমলা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ভাবেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হয়েছে। —আমিও বুঝতে পারি, হয়েছে—কিন্তু কি করব বল ? কমলা মুখ তুলিয়া বলিল, ওষুধ খাও। কাশীনাথের হাসি আসিল, কহিল, ওষুধে সারবে না।

তবে কিসে সারবে ?

তা জানি নে।

ওষুধে সারবে না, কিসে সারবে, তাও জান না; তবে কি আমার কপালটা একেবারে পুড়িয়ে দেবে?

কাশীনাথ শাদা-সিধা মানুষ; টোলে পড়া বিদ্যা; সোহাগ আদরও জানিত না! প্রণয়সম্ভাষণও তাহার আসিত না; কিন্তু এখন স্বাভাবিক স্নেহে অনুপ্রাণিত হইয়া কমলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সে বলিল, এখানে সুখ পাই না—তাই বোধ হয় এমন হয়ে যাচ্ছি।

তবে এখানে থাক কেন?

না থাকলে কোথায় যাব?

এখান ছাড়া কি আর জায়গা নেই? যেখানে সুখ পাও, সেখানে গিয়ে থাক।

তা হয় না।

কেন হয় না?

এখানে না থাকলে কি শ্বশুরমশায়ের ভাল বোধ হবে?

আর এমনই ক'রে শুকিয়ে গেলেই কি তাঁর ভাল বোধ হবে?

ভাল বোধ হবে না; কিন্তু উপায় কি? তোমার বাবা গরীব দেখে—

কমলা মুখ চাপিয়া ধরিল—ছিঃ, ও সব কথা ব'ল না। আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি উপায় করে দেব। কাশীনাথ চিন্তা করিয়া কহিল, সব কথা তোমাকে খুলে বলা যায় না। আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এই সব দেখে শুনে মনে হয়, আমাদের এ বিয়ে না হ'লেই ভাল হ'ত।

কেন?

তুমিই বল দেখি, আমাকে পেয়ে কি একদিনের তরেও সুখী হয়েছ? আমি সোহাগ জানিনে, আদর জানিনে, ধরতে গেলে কিছুই জানিনে। তোমাদের এই বয়সে কত সাধ, কত কামনা, কিন্তু তার একটিও কি আমাকে দিয়ে পূর্ণ হয়? আমি যেন তোমার স্বামী নয়, শুধু তার ছায়া।

কমলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সব কথা সে ভাল বুঝিতেও পারিল না। একটা কথা তাহার অন্তরের ভিতর হইতে এতক্ষণ ধরিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছট্‌ফট্ করিতেছিল; সেটাকে যেন বলপূর্ব্বক একটা বায়ুহীন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, বিষম পীড়াপীড়ি করিয়া এইবার বাহির হইয়া পড়িল। কম্পিতকণ্ঠে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি তুমি দেখ্‌তে পার না?

সে কথা আর একদিন বল্‌ব।

না বল—কিন্তু আমাকে বিয়ে ক'রে কি তুমি সুখী হও নি?

কি জানি, হয় ত না।

অন্য কাকে বিয়ে কর্‌লে কি সুখী হতে।

তাও ত ঠিক বলতে পারি নে। শুনিয়া কমলার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল। এই সময় একজন দাসী বাহির হইতে বলিল, দিদিমণি, মার বড় জ্বর হয়েছে—তোমাকে ডাকৃচেন।

কমলা চক্ষু মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

৫

গৃহিণীর সে জ্বর আর সারিল না। পনর দিবসমাত্র ভুগিয়া, সকলকে কাঁদাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পত্নীশোক প্রিয়বাবুর বড় বাজিল। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনিও বুঝিলেন তাঁহাকেও অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না। এইবার কমলার অনেক কাজ পড়িল; নিজের সুখ চিন্তা ব্যতীতও পৃথিবীতে অনেক কিছু করিতে হয়। বৃদ্ধ পিতা, ক্রমশঃ অপটু হইয়া আসিতেছেন, কমলা সর্ব্বদাই পিতার নিকট থাকিতে লাগিল। আর কাশীনাথ? সে সৃষ্টিছাড়া লোক; এইবার যেন সময় বুঝিয়া পুস্তকের রাশি

লইয়া গৃহের কবাট রুদ্ধ করিয়া বসিল। যখন পুস্তকে মন লাগে না, তখন বাহির হইয়া যায়। কখন হয় ত একাদিক্রমে দুইদিন ধরিয়া বাটীতেই আসে না। কোথায় আহার করে, কোথায় নিদ্রা যায়, কেহই জানিতে পারে না। এ সব দেখিয়া শুনিয়া কমলা একরকম হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে যুবতী হইলেও এখনও বালিকা মাত্র। স্বামি-প্রীতি, স্বামি-ভক্তি এখনও তাহার শিক্ষা হয় নাই। শিখিতেছিল—বাধা পড়িয়াছে; আবার স্বামী কর্ত্তৃকই বাধা পড়িয়াছে। তাহার দোষ কি? সে যাহা শিখিয়াছিল ক্রমশঃ ভুলিতে লাগিল। যে সব সোনার দাগ বুকের মাঝে ঈষৎ পড়িয়াছিল, তাহা এখনও উজ্জ্বল হয় নাই, বাহিরের সৌন্দর্য্য এখনও ভিতরে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে নাই—অযত্নে অসাবধানে তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে যখন একেবারে মিলাইয়া গেল—কমলা তখন জানিতেও পারিল না। একখানা ভগ্ন অট্টালিকার দুই-একখানা ইট, দুই-এক টুকরা কাঠ পাথর, বুকের মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে—কখনও কখনও দেখিতে পাইত, কিন্তু সে সকল একত্র করিয়া আবার জোড়া দিয়া অট্টালিকা গাঁথিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। এখানে এক সময়ে একটা রাজপ্রাসাদ ছিল, প্রমোদকানন ছিল—স্বপ্নের ঘোরে আসিয়াছিল, স্বপ্নশেষে চলিয়া গিয়াছে। সে স্বপ্ন ফিরিয়া দেখিবারও তাহার আর সাধ নাই। যাহা গিয়াছে—তাহা গিয়াছে।

বৃদ্ধ পিতার সেবা করিয়া, দাসদাসীকে আদর-যত্ন করিয়া কর্ম্মসুখে তাহার দিন অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু একের যাহাতে সুখ হয়, অন্যের তাহাতে হয়ত হয় না। কমলা যে সুখ অনুভব করিতে লাগিল বুড়া ঝি তাহাতে মর্ম্মে ক্লেশ পাইতে লাগিল। অনেক দেখিয়া শুনিয়া সে গোপনে একদিবস প্রিয়বাবুকে কহিল, জামাইবাবু যেন কি রকম হয়ে যাচ্চেন; কখন্ বাড়ীতে থাকেন, কখন্ চ'লে যান—কখন্ কি করেন,

তা বাড়ীর কেউ জানতে পারে না। দিদিমণির সঙ্গেও বোধ হয় কথাবার্ত্তা নেই।

প্রিয়বাবু নিজের শরীর ও মন লইয়া বিব্রত ছিলেন, এ সকল দেখিতে পাইতেন না। বৃদ্ধা দাসীর কথায় তাঁহার চৈতন্য হইল। কমলা আসিলে সস্নেহে কহিলেন, মা, আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তার যথার্থ উত্তর দেবে? কমলা পিতার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা বাবা?

দেখ মা, আমাকে লজ্জা করবার আবশ্যক নাই; বাপের কাছে বিপদের সময় কোনও কথা গোপন করতেও নেই; আমাকে সব কথা খুলে বল—আমি নিজে সমস্ত মিটিয়ে দিয়ে যাব। কমলা মৌন হইয়া রহিল। প্রিয়বাবু আবার কহিলেন, সুখে থাকবে ব'লে তোমাকে সুপাত্রের হাতে দিয়েছি। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই—কিন্তু তোমাকে অসুখী দেখে মরেও আমার সুখ নেই। বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কমলার চক্ষু দিয়াও জল পড়িতেছিল; বৃদ্ধ সে অশ্রু সস্নেহে মুছাইয়া বলিলেন, সব কথা আমাকে খুলে বলবি নে মা? কিন্তু কি বলিতে হইবে, কমলা তাহা খুঁজিয়া পাইল না। প্রিয়বাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আবার কহিলেন, ঝগড়া হয়েছে বুঝি? কমলা ভাবিল, ভাব থাকলে ত ঝগড়া হবে! ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

ঝগড়া হয় নি! তবে সে বুঝি তোকে দেখতে পারে না? কমলার একবার ইচ্ছা হইল—বলে, তাই বটে! কিন্তু তাহা পারিল না। স্বামী তাহাকে দেখিতে পারে না বলিতে তাহার বুকে বাজিল! সে চুপ করিয়া রহিল। প্রিয়বাবু ম্লানমুখে হাসিয়া বলিলেন, তবে তুই বুঝি দেখতে পারিস্ নে? কমলা ভাবিল, তাই হবে বুঝি! আমিই হয়ত দেখতে পারি নে। কিন্তু সে কি কথা? আমি আমার স্বামীকে দেখতে পারি নে? কমলা শিহরিয়া বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিবার প্রয়াস করিল—

দেখিল, সেখানকার গীত-বাদ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে; শুধু মাঝে মাঝে দুই-এক জন জিনিসপত্র সরাইয়া লইতে আসিতেছে, যাইতেছে; তাঁহাদেরই করস্থিত বাদ্যযন্ত্রের অসাবধানে কখনও হয়ত একটু আধটু সুর বাহির হইয়া পড়িতেছে; কখনও হয় ত দুই-এক জন অভিনেতা পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। কমলা কাঁদিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু আবৃত করিল। প্রিয়বাবু অতিশয় কাতর হইলেন; বলিলেন, কেন কাঁদিস্ মা?

বাবা, আমরা যেন কেউ কারো নয়। প্রিয়বাবু ধীরে ধীরে কন্যাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, ছি মা, ও কথা কি মুখে আনে? তুই যার মেয়ে সে যে আমার সর্ব্বস্ব ছিল; এখনও রোজ রাত্রে সে আমার পায়ের কাছে এসে ব'সে থাকে—শুধু তোদের ভয়ে দিনের-বেলা আসে না। সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, যদি সে এসে তোর এ কথা শুন্‌তে পায় তা হ'লে মনে বড় দুঃখ পাবে। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ঘরটায় অন্ধকারও হইয়াছিল; কমলা সচকিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, বাস্তবিক কেহ ঘরে আসিয়াছে কি না! কেহ কোথাও নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। সে তখন বাহিরে আসিল, তখন তাহার পা কাঁপিতেছিল; শরীর এত দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল, যেন অর্দ্ধেক রক্ত কেহ বাহির করিয়া লইয়াছে। তাহার কাজকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া, যে ঘরে কাশীনাথ মাটীর উপর আসন পাতিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পুঁথি খুলিয়া বসিয়া ছিল, সেইখানে গিয়া উপবেশন করিল। কাশীনাথ মুখ তুলিয়া দেখিল, কমলা! বিস্ময়ে বলিল, তুমি যে?

আমি এসেছি।

ব'স, বলিয়া কাশীনাথ আবার পুঁথিতে মনঃসংযোগ করিল। কমলা বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার পুঁথি পাঠ দেখিল, তাহার পর হাত দিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া দিল। কাশীনাথ আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, বন্ধ করলে যে?

তুটো কথা কও। রোজ পড়—একটু না পড়্‌লে ক্ষতি হবে না।

এই জন্যে বন্ধ ক'রে দিলে ?

শুধু তাই নয়; বিরক্ত হবে, বক্‌বে—এজন্যও বটে। কাশীনাথ অল্প হাসিয়া বলিল, কেন বিরক্ত হব কমলা ? তোমাকে কখনও কি আমি বকেছি ? কথা কও না, কাছে এস না, বই না পড়্‌লে কেমন ক'রে দিন কাটাব বল দেখি ? একটু হাসিয়া বলিল, জ্বর হয়েছে, আজ দুদিন কিছুই খাই নি, তা তুমি ত একবারও খোঁজ নাও নি! কমলা মুখ তুলিয়া দেখিল, স্বামীর মুখ বড় শুষ্ক; কপালে হাত দিয়া দেখিল, গা গরম। তখন কাঁদিয়া স্বামীর ক্রোড়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, লজ্জায় তাহার মরিতে ইচ্ছা হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি আমার দোষ ভুলে গিয়ে আর একবার আমাকে নাও, তোমার সব ভার আমাকে নিতে দাও!

আমি পারি, কিন্তু তুমি রাখ্‌তে পারবে কি ?

কেন পারব না ?

দেখি।

আমাকে নাও।

অনেক দিন নিয়েছি, কিন্তু তুমি বুঝ্‌তে পার না, এখনও হয়ত সব সময় ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বে না। কমলা প্রদীপের আলোকে সে মুখ যতখানি পারিল, দেখিয়া লইল। একবার যেন মনে হইল, সে মুখে ছাইঢাকা অনেক আগুন আছে, মোমঢাকা অনেক মধু আছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। সে পূর্ণাবেগে কহিয়া উঠিল, কেন তুমি এতদিন তোমাকে চিন্‌তে দাও নি ? কেন এতদিন আমাকে লুকিয়ে রেখে আমাকে এত কষ্ট দিলে ? আনন্দের উচ্ছ্বাসে কমলা স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল। কাশীনাথের চক্ষু দিয়াও সে দিন জল পড়িতে লাগিল।

৬

পরদিন প্রিয়বাবু কাশীনাথকে ডাকিয়া পাঠাইয়া কহিলেন, বাপু, আমি আর অধিকদিন বাঁচব না; আমার নেই পুত্র, বিষয়-আশয় যা কিছু রেখে যেতে পারলাম, তা সমস্তই তোমাদের রইল। যে কটা দিন বাঁচি, তার মধ্যে সমস্ত বুঝে-সুঝে নাও—না হ'লে কিছুই থাকবে না; অপরে সমস্ত ফাঁকি দিয়ে নেবে।

কাশীনাথ অবনতমস্তকে কহিল, আজ্ঞা করুন। প্রিয়বাবু বলিলেন, আজ্ঞা আর কি কর্‌ব! কাল হতে সকাল-বেলাটা একবার করে কাছারী ঘরে গিয়ে ব'স।

যে আজ্ঞে, বলিয়া কাশীনাথ প্রস্থান করিল। প্রিয়বাবু কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, বুড়া হয়েছি, বিষয় দেখতে পারি না, তাই কাশীনাথকে আমার জমীদারীর সমস্ত ভার দিলাম। উত্তরকালে তার কাজ করতে অসুবিধা না হয়, এজন্য মধ্যে মধ্যে উপদেশ দেব। কয়েক দিবস তিনি নিজে কাছারী ঘরে গিয়া কাশীনাথকে জমিদারী সংক্রান্ত অনেক বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। সেও হাতে একটা কাজ পাইয়া খুসী হইল। জমিদার-বাড়ীর ভিতরে ভিতরে যে একটা দাহ উপস্থিত হইয়াছিল অনেকদিন পরে তাহার জ্বালা যেন ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল।

কাশীনাথ নিয়মিতভাবে কাছারীর কাজকর্ম্ম করে, কমলা নিয়মিতভাবে সংসার চালাইয়া যায়, এবং প্রিয়বাবু নিয়মিতভাবে শয্যায় শুইয়া থাকেন। সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কিছু দিবস পরে প্রিয়বাবুর শরীরের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। এক দিবস তিনি কমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উইল করেছি। পরে উপাধানের নিম্ন হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

—আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমার জামাতা কাশীনাথকে ও অপর অর্দ্ধেক কন্যা কমলা দেবীকে দান করিলাম। কেমন, ভাল হয় নি মা? কমলা কথা কহিল না। প্রিয়বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন মা, তোমার মনোমত হয় নি কি? এ উইল তিনি বিশেষ করিয়া কমলাকে খুসী করিবার জন্যই করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, তাহার স্বামী সম্পত্তির সত্যকার মালিক হইলে কমলাও অত্যন্ত প্রীত হইবে। কিন্তু কমলা যে কথা ভাবিতেছিল, তাহা মুখে বলিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। প্রিয়বাবু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু বলবে কি?

কমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

কি মা?

কমলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, সমস্ত বিষয় আমার নামে লিখে দাও।

সে কি কথা মা?

কমলা মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রিয়বাবু প্রাচীন লোক। সংসারে অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন; কমলার মনের কথা তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন রহিল না। একে একে সব কথা যেমন তলাইয়া বুঝিতে লাগিলেন, অল্প অল্প করিয়া তেমনই অবসন্নতা তাঁহার শরীর ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। উপাধানে ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন, এখন সেই উপাধানে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না। সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে যাব। কিন্তু কাজটা ভাল হবে না। আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও। কিন্তু সে ভরসা আর করতে পারি না। দীর্ঘ জীবনে অনেক দেখেছি, নিজেও তিনবার

বিবাহ করেছি—এরূপ মন নিয়ে জগতে কোনও স্ত্রী কখনও সুখী হতে পারে না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আবার বলিলেন, দেখতে ভাল হবে, তুমি খুসী হবে, এই মনে করে তোমাদের দুজনকেই সমান ভাগ করে সমস্ত বিষয় দিয়ে যাচ্ছিলাম; জানতাম তুমি আর সে ভিন্ন নও। আচ্ছা, বল দেখি মা, কি জন্য তার বিষয়প্রাপ্তিতে তোমার অমত হচ্ছে? কমলা কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, বিষয় পেলে আর আমার পানে ফিরে চাইবেন না।

বিষয় না পেলে?

আমার হাতে থাক্‌বেন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, আমি কাশীনাথকে চিনি, কিন্তু তুমি চেন না। সে ঠিক তার বাপের মত। যদি তোমায় দেখতে না পারে, তা হলে বিষয় পেলেও দেখতে পারবে না, না পেলেও দেখতে পারবে না। আর কমলা! এমন করেই কি স্বামীকে হাতে রাখা যায়? জোর করে বনের বাঘ বশ করতে পারা যায়, কিন্তু জোর করে একটি ছোট ফুলকেও ফুটিয়ে রাখা যায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পুনরায় কহিলেন, প্রার্থনা করি সফল হও—কিন্তু এ ভাল উপায় নয়। সে যদি তোমাকে না নেয়, তা হলে কতটুকু তোমার অবশিষ্ট থাক্‌বে! যেটুকু থাক্‌বে, তাতে অর্দ্ধেক সম্পত্তিতে কি চলে না? আরও এক কথা, স্বামীকে দেহ মন আত্মা পার্থিব অপার্থিব সব দিতে হয়—যাকে সব দিতে হয়, তাকে এই অর্দ্ধেক বিষয়টুকু কি দেওয়া যায় না? কমলা, এমন করিস্ নে মা। যদি কখনও সে জানতে পারে, মনে কষ্ট পাবে।

কমলা কোনও উত্তর দিল না, প্রিয়বাবুও আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। দুজনে প্রায় আধ ঘণ্টা মৌন হইয়া রহিলেন। অন্ধকার

হইয়া আসিতেছে; দাসী প্রদীপ দিয়া গেল; কমলাও চক্ষু মুছিয়া আপনার নিত্য কর্ম্মে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রিয়বাবু তাঁহার উকীলকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উইল বদ্‌লাব।

উকিল জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ বদ্‌লাবেন?

আমার জামাতার নাম কেটে সমস্ত সম্পত্তি কন্যাকে লিখে দেব।

কেন?

সে কথার প্রয়োজন নাই! যা বললাম, সেইরূপ লিখে দিন।

৭

প্রিয়বাবুর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-শান্তি হইলে উইল দেখিয়া কাশীনাথ কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিস্মিত হইল না। জগতে যাহা নিত্য ঘটে, যাহা ঘটা উচিত—তাহাই ঘটিয়াছে; ইহাতে দুঃখই বা কি, আর আশ্চর্য্য বা কেন? তথাপি দেওয়ান মহাশয় কাশীনাথকে নিভৃতে পাইয়া বলিলেন, জামাইবাবু, কর্ত্তা মশায় যে এরূপ উইল করবেন, তা আমি কখনও ভাবি নাই। পূর্ব্বে তিনি একবার উইল করেছিলেন, তাতে আপনাকে ও তাঁর কন্যাকে সমান ভাগ করে দিয়েছিলেন। সে উইল যে কার কথা শুনে বা কি ইচ্ছায় বদলিয়ে দিলেন, তা কিছুই বুঝতে পারছি না।

কাশীনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, বুঝবার প্রয়োজনই বা কি। যার বিষয়, সে পেয়েছে; তাতে আমারই বা কি, আর আপনারই বা কি?

দেওয়ানজী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, তবুও—তবুও—

কিছুই 'তবুও' নাই। বস্তুতঃ আমার সম্পত্তিতে অধিকার কি? বরং আমাকে অর্দ্ধেক দিয়ে গেলেই আশ্চর্য্য হবার কথা ছিল বটে; আরও

আমাকে অর্দ্ধেক দেওয়াও যা, তাঁকে সমস্ত দেওয়াও তাই। কিছু প্রভেদ আছে কি? দেওয়ান এবার বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইলেন। শুষ্কমুখে বলিলেন, না না, প্রভেদ কিছু নাই, আমি শুধু কর্ত্তামশায়ের কথা বলছিলাম। তাঁর অভিপ্রায় আমি অনেক জানতাম, এই জন্যই এ কথা বলছিলাম।

তিনি তাঁর কর্ত্তব্যই করেছেন। ভেবে দেখুন স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন গতি নাই, কিন্তু স্বামীর স্ত্রী ভিন্ন অন্য গতি আছে। আমি দরিদ্র; একেবারে অতটা বিষয় নিজ হাতে পেলে হয়ত কুফল ফলতে পারে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় পূর্ব্বের উইল বদলিয়ে গিয়েছেন।

বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয় কাশীনাথকে বরাবর পণ্ডিত-মূর্খ টুলো ভট্টাচার্য্য মনে করিতেন; তাহার মুখে এরূপ বুদ্ধির কথা শুনিয়া ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে বৃদ্ধ দেওয়ান উত্তরোত্তর কাশীনাথের বিজ্ঞতার যত পরিচয় পাইতে লাগিলেন, অন্যদিকে কমলার উত্তরোত্তর তত অজ্ঞতার পরিচয় পাইতে লাগিলেন। দিনের মধ্যে শতবার সে আপনাকে প্রশ্ন করে, ইনি কেমন-তর মানুষ? শতবার বিফল প্রশ্ন শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিয়া কহে, বুঝিতে পারি না।

সহস্র পরিশ্রমে সহস্র চেষ্টায় কমলা কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, এই দুই-হাত-পা সমন্বিত মানুষটা কিসে নির্ম্মিত! মনটা তাহার নিজের শরীরের ভিতর রাখিয়াছে, না আর কাহারও কাছে জমা দিয়া আসিয়াছে? সে দেখে, সকলে যাহা করে, তাহার স্বামীও তাহাই করে। আহার করে, নিদ্রা যায়, জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম, সংসারের কাজ-কর্ম্ম সমস্তই করে, সমস্ত বিষয়ে যত্নশীল, অথচ সমস্ত বিষয়েই উদাসীন। কি যে তাহার স্বামী ভালবাসে, কিসে যে তাহার অধিক স্পৃহা, এতদিনেও কমলা তাহা ধরিতে পারিল না। কমলার অসুখের সময়ে কাশীনাথ অনিমেষচোখে

দিবা-রাত্রি তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত; সে মুখে কাতরতা, সে বুকে কত স্নেহ কত ভালবাসা, যেন তাহা ফুটিয়া বাহির হইত; আবার ভাল হইবার পর কমলা পথের মাঝে পড়িলেও কাশীনাথ ফিরিয়া চাহে না, মুখ তুলিয়া দেখে না। আপনার মনে আপনার কর্ম্মে চলিয়া যায়। কমলা অভিমান করিয়া দুই দিন কথা না কহিয়া দেখিয়াছে, কোন ফল নাই; কাশীনাথ কাছে আসিয়া আবার চলিয়া যাইত; না সাধিত, না কাঁদিত, না কথা কহিত। আবার কথা কহিলে হাসিয়া কথা কহিত; না কোনদিন বিরক্তি প্রকাশ করিত, না কোনদিন জিজ্ঞাসা করিত, কেন দুই দিন কথা কহ নাই, কেন রাগ করিয়াছিলে? কমলা দিন-কতক পরে নিজের মনে পরামর্শ আঁটিয়া এরূপ ভাব ধরিল, যেন সে তাহার উদাসীন স্বামীটিকে জানাইতে চাহে, তুমি আমাকে উপেক্ষা করিলে আমিও উপেক্ষা করিতে জানি। আর এত তোমাকে ভালবাসি না যে, তুমি মাড়াইয়া যাইবে, আর আমি ধূলার মত তোমার চরণতলে জড়াইয়া থাকিব। কমলা দেখা হইলে অন্য মনে মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া যায়; যেন প্রকাশ করিতে চাহে, তোমাকে দয়া করিয়া স্বামী করিয়াছি বলিয়া এমন মনে করিও না যে, তোমার পায়ে প্রাণ পড়িয়া আছে, এবং সেই জন্য যখনই দেখা হইবে, তখনই মিষ্ট হাসিয়া প্রীতি-সম্ভাষণ করিব। আমার কাজের সময় সাম্‌নে পড়িলে আমিও দেখিতে পাই না। যখন সে কোন দাস-দাসীকে তিরস্কার করিতে থাকে তখন কাশীনাথ দৈবাৎ যদি কোনও কথা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে কথা আদৌ কানে না তুলিয়া যাহা বলিতেছিল, তাহাই বলিতে থাকে; যেন বলিতে চাহে, আমার দাস, আমার দাসী, আমার বাড়ী, আমার ঘর; যাহাকে যাহা খুসী বলিব, তুমি তাহাতে অযাচিত মধ্যস্থ হইতেছ কেন?

কিন্তু ইহাতে কি তৃপ্তি হয়? এমন করিয়া কি বাসনা পূরে? তৃপ্তি

হইতে পারিত, যদি কাশীনাথকে একবিন্দু টলাইতে পারিত। যাহাই কর, সে তাহার প্রশান্ত গম্ভীর মুখখানি লইয়া পরিষ্কার বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি নিশ্চল বসিয়া আছে, সুমেরু শিখরের মত তাহাকে একবিন্দু স্থানচ্যুত করিবার ক্ষমতাও তোমার নাই। যত খুসী ঝড়বৃষ্টি তোল, যত ইচ্ছা গাছ-পালা ওলট-পালট করিয়া দাও, কিন্তু আমাকে টলাইতে পারিবে না।

আচ্ছা, কমলা কি ভালবাসে না? বাসে, কিন্তু সে ভালবাসা অনন্ত অতলস্পর্শী নহে; কমলা যেন রেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে চাহে, তুমি ইহার বাহিরে যাইও না! যাইলে আমি সহ্য করিতে পারিব না। হয় ত তথাপিও ভালবাসিব, কিন্তু তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করিব না।

একদিন সে বৃদ্ধা দাসীর কাছে মনের দুঃখে কাঁদিয়া বলিল, বাবা আমাকে একটা জানোয়ারের হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন।

কেন দিদি?

কেন আবার জিজ্ঞাসা করিস্? তোরা সবাই মিলে আমাকে কেন হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিস্ নি?

ও কথা কি বল্‌তে আছে দিদি?

কেন বল্‌তে নেই? তোরা যে কাজটা কর্‌তে পারলি, আমি তার কথা মুখেও একবার বল্‌তে পার্‌ব না!

না, না, তা নয়। উনি দিব্যি মানুষ; তবে একটু পাগলামীর ছিট্ আছে। ওঁর বাপেরও একটু ছিল তাই জামাইবাবুরও—

তুই চুপ কর্। পাগলের কথা মুখে আনিস্ নে। বাপ পাগল হলেই কিছু আর ছেলে পাগল হয় না। পাগল একটুও নয়, শুধু ইচ্ছে করে আমাকে কষ্ট দেয়।

স্বামী পাগল, এ কথা স্বীকার করিতে কমলার বুকে বাজিল।

*   *   *   *

আজ তিন দিন হইল কাশীনাথের দেখা নাই। দুই দিন কমলা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও খোঁজ লইল না, কিন্তু তৃতীয় দিবসে উদ্বিগ্ন হইয়া বাহিরে দেওয়ানকে বলিয়া পাঠাইল, বাবু দুই দিন ধরিয়া বাটীতে আসেন নাই, তোমরাও কোনও সন্ধান কর নাই, তবে কি জন্য এখানে আছ? দেওয়ান ভাবিল, মন্দ নয়? কে কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহার আমি কিরূপে সন্ধান রাখিব? পরে খাজাঞ্চীর নিকট খবর পাইল যে, জামাইবাবু তিন সহস্র টাকা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কিংবা কবে ফিরিবেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই।

কমলা কিছুক্ষণ কপালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল; পরে তাহার পিতার উকীলবাবুকে ডাকিয়া বলিল, আমার বিষয়-সম্পত্তি দেখ্‌তে পারে, এমন একজন লোক এক সপ্তাহের মধ্যে বাহাল করে দিন; যেমনই বেতন হোক, আমি দেব।

৮

কলিকাতার একটা ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত গলির ভিতর একখানা ছোট একতালা বাটীতে, সমস্ত দিন জলে ভিজিয়া একহাঁটু কাদা পাঁক লইয়া কাশীনাথ প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুই শিশি ঔষধ, এক টিন বিস্কুট ও চাদরে বাঁধা বেদানা প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ছিল।

এই বাটীর একটী কক্ষে নীচের শয্যায় একজন রোগী শয়ান ছিল, এবং নিকটে বসিয়া একটী স্ত্রীলোক তাহার মস্তকে হাত বুলাইতেছিল। কাশীনাথ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকটি কহিল, কাশীদাদা, এত জলে ভিজে এলে কেন? কোথাও দাঁড়ালে না কেন?

তা কি হয় বোন? জলে ভিজে ক্ষতি হয় নি, কিন্তু দাঁড়ালে হয়ত হ'ত।

তা বটে! বিন্দু বুঝিয়া দেখিল, কাশীদার কথা অসত্য নহে—তাই চুপ করিয়া রহিল।

এই কয় বৎসর ধরিয়া বিন্দু যে ক্লেশ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা কেবল সেই জানে! আমরা তাহার বাপের বাড়ীতে তাহাকে শেষ দেখিয়াছিলাম, আর দেখি নাই! এখন একটু তাহার কথা বলি। যে দিন সে জমীদারের মেয়েকে দেখিতে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াও যাইতে পায় নাই, তাহার পরদিনই গোপালবাবুর (তাহার শ্বশুরের) সহসা কঠিন ব্যাধির সংবাদ পাইয়া তাহাকে স্বামী-ভবনে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। সে আসিয়া দেখিল, তাহার শ্বশুরের যথার্থই বড় কঠিন পীড়া হইয়াছে। সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইল, কিন্তু গোপালবাবুর কিছুতেই প্রাণ রক্ষা হইল না। পীড়া বড় বাড়িয়া উঠিলে, গোপালবাবু কহিলেন, ছোটবৌমাকে একবার নিয়ে এস—তাঁকে একবার দেখ্‌ব। ছোটবৌমা আমাদিগের বিন্দুবাসিনী। মৃত্যুর দুই একদিবস পূর্ব্বে গোপালবাবু বিন্দুকে বলিলেন, মা, এই চাবি নাও, ঐ বাক্সে যা রইল সব তোমাকে দিলাম। বিন্দু হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। অন্যান্য বধূরা মনে করিল, বৃদ্ধ মরিবার সময় বিন্দুকেই সব দিয়া গেল। আরও এক কথা, গোপালবাবু পীড়ার মধ্যেই একদিন চারি সন্তানকেই কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ বাপু, তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে কিছুমাত্র মিল নাই, এবং তোমাদের জননীও জীবিত নাই, তখন আমার মৃত্যু হলে তোমরা আর এক সংসারে থেকো না। মিথ্যা কলহ করে ভিন্ন হবার পূর্ব্বে যেটুকু সম্ভাব আছে, তা নিয়ে পৃথক হও। যা কিছু রেখে গেলাম, তার ওপর কিছু কিছু উপার্জ্জন করলে তোমাদের সংসার স্বচ্ছন্দে চলবে।

পিতার মৃত্যুর পরে সকলে পৃথক হইলে, বিন্দু একদিন বাক্স খুলিয়া দেখিল, ভিতরে একখানি রামায়ণ ও একখানি মহাভারত ভিন্ন আর কিছুই নাই। আশায় নিরাশ হইলেও বিন্দু স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ের দান মাথায় তুলিয়া লইল। বিন্দু অস্ফুটস্বরে বলিল, তাঁহার স্নেহের দান—ইহাই আমার রত্ন।

দিন-কতক বিন্দুর সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিল; তাহার পর বিপদের আরম্ভ হইল। বিন্দুর স্বামী যোগেশবাবু পীড়িত হইয়া পড়িলেন। বিন্দু শরীরপাত করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিল, কয়েকখানি জমী বন্ধক দিয়া চিকিৎসা করাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গ্রামস্থ কয়েক জন প্রতিবাসী তখন কলিকাতায় যাইয়া চিকিৎসা করাইতে বলিল। বিন্দুবাসিনী আপনার সমস্ত গহনা বিক্রয় করিয়া স্বামীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল। এখানেও বহু রকমের চিকিৎসা করাইতে অবশিষ্ট জমীগুলি ক্রমশঃ বন্ধক পড়িল। কিন্তু রোগের কিছুই হইল না। অর্থাভাবে এখন উত্তমরূপে চিকিৎসা করাইবার উপায় রহিল না। বিন্দু স্বামীর অগ্রজকে সব কথা লিখিয়া জানাইল। কিন্তু কোন ফল হইল না; তিনি উত্তর পর্য্যন্ত লিখিলেন না। তখন সে তাহার অপর দুই ভাশুরকে লিখিল, কিন্তু তাহারাও অগ্রজের পন্থা অবলম্বন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। বিন্দু বুঝিল, এখন হয় উপবাস করিতে হইবে, না হয় বিষ খাইয়া মরিতে হইবে।

স্ত্রীর মুখ দেখিয়া যোগেশবাবু সমস্তই বুঝিতে পারিতেন। একদিন তাহাকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে হাত ধরিয়া বলিলেন, বিন্দু, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল; মরতে হয়, সেইখানেই মরব—এখানে ফেলবার লোক পাবে না।

এইবার বিন্দু দেখিল, মরণই নিশ্চিত; কেন না অন্য উপায়ও নাই,

স্বামীকে বাটী ফিরাইয়া লইয়া যাইবারও উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাকে এ অবস্থায় রাখিয়া কেমন করিয়া মরিবে? আর যদি মরিতেই হয়, তখন লজ্জা করিয়া কি হইবে? অনেক বিতর্কের পর সে লজ্জার মাথা খাইয়া এ কথা কাশীনাথকে পত্র দ্বারা বিদিত করিল। পরের ঘটনা আপনাদের অবিদিত নাই!

আসিবার সময় কাশীনাথ অনেক টাকা আনিয়াছিল। সেই টাকা দিয়া সহরের উৎকৃষ্ট ডাক্তারদিগের মত জিজ্ঞাসা করায় সকলেই কহিল যে, বায়ু পরিবর্ত্তন না করিলে আরোগ্য হইবে না। কাশীনাথ সকলকে লইয়া বৈদ্যনাথ উপস্থিত হইল। এখানে থাকিয়া মাস-দুয়ের মধ্যে সবাই বুঝিতে পারিল, যোগেশবাবু এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। তথাপি ফিরিবার সময় এখনও হয় নাই; সেই জন্য তাঁহাদিগকে এখানে রাখিয়া কাশীনাথ বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

প্রাতঃকালে কমলার সহিত দেখা হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলে?

রাত্রে এসেছি।

কমলা আপনার কর্ম্মে চলিয়া গেল। কাশীনাথ বাহিরে আসিয়া কাছারী ঘরে প্রবেশ করিল। বহুদিনের পর তাঁহাকে দেখিয়া কর্ম্মচারিগণ দাঁড়াইয়া উঠিল; শুধু একজন সাহেবী পোষাক পরা যুবক আপনার কাজে চেয়ারে বসিয়া রহিল। একজন আগন্তুককে দেখিয়া অপরাপর কর্ম্মচারীরা যে সম্মান করিল, নব্যবাবু বোধ হয় তাহা দেখিতে পাইলেন না। কাশীনাথ নিজে একটা কেদারা টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। এই লোকটি নূতন ম্যানেজার হইয়া আসিয়াছেন; নাম শ্রীবিজয়কিশোর দাস। কলিকাতায় বি-এ পাশ করিয়াছিলেন; এবং অতিশয় কর্ম্মদক্ষ লোক তাই উকীল বিনোদবাবু ইহাকেই ম্যানেজারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ম্যানেজার অনেকক্ষণের পর কাশীনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, মশাইয়ের কোনও প্রয়োজন আছে কি ?

না, প্রয়োজন নাই, কাজকর্ম্ম দেখছি মাত্র ।

এবার দেওয়ান-মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইনি আমাদের জামাইবাবু। বিজয়বাবু গাত্রোত্থান করিয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিলেন ; এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বিজয়বাবুকে কহিল, ভিতরে মা একবার আপনাকে ডাকৃছেন। বিজয়বাবু প্রস্থান করিলে কাশীনাথ দেওয়ানকে ডাকিয়া কহিল, ইনি কে ?

নূতন ম্যানেজার।

কে রাখ্‌লে ?

মা রেখেছেন।

কেন ?

বোধ হয় কাজকর্ম্ম সুবিধামত হচ্ছিল না বলে।

এখন কোথায় গেলেন ?

বাড়ীর ভিতরে ।

কাশীনাথ আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া ভিতরে আসিল ; আসিবার সময় দেখিল, একটা ঘরের পরদার সম্মুখে বিজয়বাবু দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাহার অন্তরাল হইতে আর একজন মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন। কাহার কথা কহিতেছে, কাশীনাথ বুঝিতে পারিল, কিন্তু কোনও কথা না কহিয়া, সে দিকে একবার না চাহিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে কমলার সহিত আর একবার তাহার দেখা হইল। কমলা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, শরীর ভাল আছে ত ? কাশীনাথ সেইরূপ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আছে। আর কোনও কথা না কহিয়া কমলা চলিয়া গেল। দাঁড়াইয়া কথা-বার্ত্তা, গল্প-গুজব করিবার সময় এখন আর তাহার

নাই, এখন সহস্র কাজ পড়িয়াছে; বিশেষত, নিজের বিষয় নিজের হাতে লইয়া তাহার আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। একদিন সকাল-বেলা কাশীনাথ ম্যানেজারবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভৃত্যমুখে ম্যানেজার জবাব দিলেন, এখন সময় নাই, সময় হলে আস্‌ব। কাশীনাথ তখন স্বয়ং কাছারী ঘরে আসিয়া, বিজয়বাবুকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল, আপনার সময় নাই বলে আমি নিজে এসেছি। আজ আমার পাঁচ শত টাকার প্রয়োজন আছে; সময় হলে তা উপরে পাঠিয়ে দেবেন।

কি প্রয়োজন?

তা আপনার শুনবার প্রয়োজন নাই।

নাই সত্য। কিন্তু মালিকের অনুমতি বিনা কেমন করে দেব?

কাশীনাথ বুঝিল, কথাটা অন্য রকমের হইয়াছে। কহিল, আমার কথাই বোধ হয় যথেষ্ট। অন্য অনুমতির প্রয়োজন আছে?

বিজয়বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, আছে! যাকে তাকে টাকা দিতে নিষেধ আছে?

কাশীনাথ কমলার সহিত দেখা করিয়া কহিল, তোমার নূতন লোকটাকে তাড়িয়ে দাও।

কাকে?

যে তোমার ম্যানেজার হয়ে এসেছে।

কেন, তার দোষ কি?

আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি।

কি করেছে?

আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু না এসে—চাকরের মুখে বলে পাঠালে, আমার সময় নাই—যখন হবে তখন যাব। কমলা সহাস্যে বলিল, হয়ত সময় ছিল না। সময় না থাক্‌লে কেমন ক'রে আস্‌বে?

কাশীনাথ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, বেশ, সময় ছিল না ব'লে যেন আস্‌তে পারে নি, কিন্তু আমি নিজে গিয়ে যখন টাকা চাইলাম, তখন বল্‌লে যে মালিকের হুকুম ছাড়া দিতে পারি না।

কমলা মধুরতর হাসিয়া বলিল, কত টাকা চেয়েছিলে ?

পাঁচ শ।

দিলে না ?

না। তুমি আমায় টাকা দিতে কি নিষেধ করেছ ?

হাঁ, যা তা ক'রে টাকাগুলো উড়িয়ে দিতে আমার ইচ্ছা নাই।

কাশীনাথ—পাথরের কাশীনাথ হইলেও মর্ম্মে পীড়া পাইল। এরূপ ব্যবহার বা এরূপ কথা সে পূর্ব্বে আর শুনে নাই। বড় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমাকে দেওয়া কি উড়িয়ে দেওয়া ?

যেমন করেই হোক, নষ্ট করার নামই উড়িয়ে দেওয়া।

প্রয়োজনে ব্যয় করার নাম নষ্ট করা নয়।

কিসের প্রয়োজন ?

একজনকে দিতে হবে।

দিতে ত হবে, কিন্তু পাবে কোথায় ? নিজের থাকে ত দাও গে—আমি বারণ করব না। কাশীনাথ চুপ করিয়া রহিল, কথাটা তাহার কানে অগ্নিশলাকার মত প্রবেশ করিল। বাহিরে আসিয়া সে আপনার ঘড়ী আংটী প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া পাঁচ শত টাকা বৈদ্যনাথে পাঠাইয়া দিল। নীচে একস্থানে লিখিয়া দিল, আর কিছু চাস নে বোন, আমার আর কিছুই নেই।

সেই দিন হইতে কাশীনাথ আর ভিতরে প্রবেশ করে না; কমলাও কোনও খোঁজ লয় না। এমনই দিন কতক্ গত হইবার পর একদিন একটা ভৃত্য আসিয়া কহিল, আপনার কাছে একজন ব্রাহ্মণ আস্‌তে চান।

পরক্ষণেই কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিল, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাতে পৈতা জড়াইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনি মহৎ ব্যক্তি, ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্বান্ত করবেন না।

কাশীনাথ ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েছে? ব্রাহ্মণ কহিল, আপনার কত আছে, কিন্তু আমার ঐ জমীটুকু ভিন্ন অন্য উপায় নাই; ওটুকু আর নেবেন না। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল।

কাশীনাথ ব্যস্ত হইয়া ব্রাহ্মণের হাত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সব কথা খুলে বলুন। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আপনি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, শপথ করে বলুন দেখি যে, ক্ষেত্রপালের দরুণ জমীটা আমার নয়?

কে বলেছে আপনার নয়।

তবে বিজয়বাবু, আপনার নূতন ম্যানেজার আমার নামে নালিশ করেছেন কেন?

নালিশ করেছে, আমি ত জানি না।

সমন দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল, যখন মোকদ্দমা হয়েছে, তখন মোকদ্দমা করব এবং আপনাকে সাক্ষী মানব। আমি দরিদ্র, আপনার সঙ্গে বিবাদ সাজে না; তথাপি সর্ব্বস্বান্ত হবার পূর্ব্বে নিজের সম্পত্তি বিনা আপত্তিতে ছেড়ে দেব না! ব্রাহ্মণ ক্রোধ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া হাত ধরিয়া কাশীনাথ পুনর্ব্বার তাঁহাকে বসাইয়া বলিল, যাতে ভাল হয়, সে চেষ্টা আমি করব; পরে আপনার যেমন ইচ্ছা সেরূপ করবেন।

কাশীনাথ ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া বিজয়বাবুকে ডাকিয়া বলিল, ও জমীটা আমাদের নয়, মিথ্যা ব্রাহ্মণকে ক্লেশ দিচ্ছেন কেন?

মনিবের হুকুম?

কাশীনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, মনিব কি পরের জিনিষ চুরি করতে শিখিয়ে দিয়েছে?

ওটা আমাদের জিনিষ।

না আপনাদের নয়।

বিজয়বাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, আমি ভৃত্য মাত্র; যেরূপ আজ্ঞা হয়েছে, সেরূপই করেছি এবং করব।

এ কথা কমলাকে জানাইতে কাশীনাথের লজ্জা করিতেছিল। তথাপি বলিল, ও জমীটা তোমার নয়; ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব অপহরণ করো না।

অপহরণ করছি কে বললে?

যেই বলুক—ও জমীটা তোমার নয়। মিথ্যা মোকদ্দমা করতে বিজয়-বাবুকে নিষেধ করে দাও। কমলা বিরক্ত হইয়া বলিল, বিজয়বাবু কাজের লোক, তিনি নিজের কাজ বুঝতে পারেন। তাঁর কাজে তোমার হাত দেবার প্রয়োজন নাই।

দিন-কয়েক পরে বিচারের দিন। সাক্ষী-মঞ্চে দাঁড়াইয়া কাশীনাথ কহিল, আমি স্বর্গীয় শ্বশুর মশায়ের সময় হতে বিষয় দেখে আসছি এবং পরে নিজেও বহু দিন তত্ত্বাবধান করেছি—আমি জানি, ও জমী কমলা দেবীর নয়।

বিজয়বাবু মোকদ্দমা হারিয়া শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। অপর পক্ষ দুই হাত তুলিয়া কাশীনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

৯

পরদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিজয়বাবু মোকদ্দমার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশেষে নিজের টীকা-টীপ্পনী ও মতামত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কেবল জামাইবাবুর জন্য আমরা এ মোকদ্দমা হেরে গেলাম। তখন পরদার অন্তরালে একগুণ কমলা দশগুণ হইয়া ফুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ভিতর হইতে কমলা কহিল, আপনি ভিতরে আসুন, অনেক কথা আছে। বিজয়বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দুইজনে বহুক্ষণ মৃদু মৃদু কথা হইল, তাহার পর বিজয়বাবু বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

আজ বহু দিনের পরে কাশীনাথের আহার করিবার সময় কমলা আসিয়া বসিল। এখন আর তাহার পূর্ব্বের উগ্রমূর্ত্তি নাই, বরং সম্পূর্ণ শান্ত ও স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে কমলা কহিল, ঘরভেদী বিভীষণের জন্য সোনার লঙ্কাপুরী ছাই হ'য়ে গিয়েছিল—জান? আহার করিতে করিতে কাশীনাথ কহিল, জানি।

কমলা কহিল, জান্‌বে বৈ কি! সেও ত পরের অন্নেই মানুষ কি না।

কাশীনাথ কোন কথা কহিল না।

কমলা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, তাই ভাবি, যে চিরকাল পরের খেয়ে মানুষ—এখনও যাকে পরের না খেলে উপোস কর্‌তে হয়, তার সত্য কথা বল্‌বার সখই বা কেন, আর এত অহঙ্কারই বা কেন?

কাশীনাথ নিঃশব্দে একটির পর একটি করিয়া গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

যার খায়, তার গলায় ছুরি দিতে কসাইয়ের মনেও দয়া হয়।

কমলা !

যে স্ত্রীর অন্নে প্রতিপালিত, তার তেজ শোভা পায় না। তোমার দিন দিন যে রকম ব্যবহার হচ্চে, তাতে চক্ষুলজ্জা না থাকলে—

কাশীনাথ হাসিয়া বলিল, বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিতে ?

দিতামই ত।

অর্দ্ধভুক্ত অন্ন ঠেলিয়া রাখিয়া কাশীনাথ কমলার প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, কমলা! আমি পূর্ব্বে কখনও রাগ করি নাই, কখনও তোমায় রূঢ় কথা বলি নাই ; কিন্তু তুমি যা বললে, তা পূর্ব্বে বোধ হয় আর কেউ বলে নাই। আজ হতে তোমার অন্ন আর খাব না। দেখ, যদি এতে সুখী হতে পার! কাশীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলাও সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া কহিল, যদি সত্যবাদী হও, যদি মানুষ হও, তা হলে আপনার কথা রাখবে।

তা রাখব। কিন্তু তুমি যে কথা বললে, তা তোমারই চিরশত্রু হয়ে রইল। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে কি ক্ষমা করবেন ?

কমলা আরও জ্বলিয়া উঠিল—তোমার শাপে আমার কিছুই হবে না।

তাই হোক্। ভগবান জানেন, আমি তোমাকে শাপ দিই নাই, বরং আশীর্ব্বাদ করছি—ধর্ম্মে মতি রেখে সুখী হও।

বাহিরে আসিয়া কাশীনাথ ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি সমস্ত একে একে ছিন্ন করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল, ভৃত্যবর্গকে ডাকিয়া নিজের যাহা কিছু ছিল, বিলাইয়া দিল। তাহার পর রাত্রে কমলার কক্ষদ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, কমলা! কমলা জাগিয়া ছিল, কিন্তু উত্তর দিল না। দ্বার খোলা ছিল, কাশীনাথ ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চোখ বুজিয়া কমলা শয্যায় পড়িয়া আছে। কাছে বসিয়া মাথায় হাত

দিয়া কাশীনাথ আবার ডাকিল, কমলা! কোন উত্তর নাই। যাবার সময় আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, বলিয়া কাশীনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কাশীনাথ প্রস্থান করিলে, কমলা শয্যা ত্যাগ করিয়া জানালায় আসিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া প্রভাত হয় দেখিয়া সে আবার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন কমলা দেখিল, বেলা হইয়াছে, এবং বাড়ীময় বিষম হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই একজন দাসী ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, সর্ব্বনাশ হয়েছে মা, জামাইবাবু খুন হয়েছেন। কাহারও অঙ্গে এক কটাহ জ্বলন্ত তৈল নিক্ষেপ করিলে সে যেমন করিয়া উঠে, কমলাও তেমনি করিতে করিতে নীচে আসিয়া কহিল, একেবারে খুন হয়ে গেছে?

কে একজন জবাব দিল, একেবারে।

বিবসনা-প্রায় কমলা যখন বাহিরের ঘরে আসিয়া পড়িল, তখন রক্তসিক্ত চৈতন্যহীন কাশীনাথ একটা শোফার উপর পড়িয়াছিল, সমস্ত অঙ্গে ধূলা ও রক্ত জমাট বাঁধিয়া আছে; নাক, মুখ, চোখ দিয়া অজস্র রক্ত নির্গত হইয়া সেইখানে শুকাইয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছে। চীৎকার করিয়া কমলা মাটির উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সমস্ত গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, জমীদার-জামাইবাবু অন্ধকার রাত্রে একা কোথায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে খুন হইয়া গিয়াছেন।

দুইদিন পরে কাশীনাথের জ্ঞান হইলে, পুলিসের সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, কে এমন করেছে? কাশীনাথ উপর পানে চাহিয়া বলিল, উনি করেছেন! বৃদ্ধ নায়েব সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সাহেব আবার বলিল, বাবু, তাদের কি আপনি চিনতে পারেন নাই?

কাশীনাথ অস্ফুটে কহিল, হাঁ। সাহেব ব্যগ্র হইয়া কহিল, কে তারা?

কাশীনাথ একটু মৌন থাকিয়া কহিল, আমি ভুল বলেছি। তাদের চিনতে পারি নাই।

সাহেব আরও বার-দুই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। কাশীনাথ আর দ্বিতীয় কথা কহিল না। পরদিন নায়েবকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, বৈদ্যনাথে আমার ভগিনী বিন্দুবাসিনী আছে, তাকে একবার দেখব; আপনি আনতে লোক পাঠান।

তিন দিন পরে বিন্দুবাসিনী ও যোগেশবাবু আসিয়া পড়িলেন। বিন্দু শক্ত মেয়ে, কমলার মত নহে; তাই চীৎকারও করিল না, মূর্চ্ছাও গেল না। শুধু চোখের জল মুছিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, কাশীদাদা, কে এমন করেছে?

কেমন ক'রে জানব?

কারও ওপর সন্দেহ হয় কি?

সে কথা জিজ্ঞাসা ক'র না বোন। বিন্দু চুপ করিয়া কাশীনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সকলেই জানিত, কাশীনাথ এ আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। মৃত্যু যেন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। আজ অনেক রাত্রে জ্বরের প্রকোপে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কাশীনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল, বল কমলা, এ কাজ তুমি কর নি? বিন্দু কাছে আসিয়া দাদার মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বলচ দাদা?

কাশীনাথ বিন্দুকে কমলা ভ্রম করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া করুণ-কণ্ঠে আবার বলিল, আমি মরেও সুখ পাব না কমলা, শুধু একবার বল, এমন কাজ তোমার দ্বারা হয়নি?

জ্ঞানে, অজ্ঞানে, তন্দ্রায় আচ্ছন্নের মত কমলার দুই দিন কাটিয়া গেল। তাহার জন্য ডাক্তারের মনে মনে আশঙ্কা ছিল, তাই তাঁহার উপদেশে অত্যন্ত সতর্কভাবে তাহাকে সকলে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। আজ দুই দিন অবিশ্রাম চেষ্টা-শুশ্রূষায় সন্ধ্যার পর তাহাকে সচেতন করিয়া উঠাইয়া বসাইল।

ভাল করিয়া চোখ চাহিয়া কমলা দেখিল, যে এতক্ষণ তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?

অপরিচিতা কহিল, আমি বিন্দু, তোমার স্বামীর ভগিনী।

কমলা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়া তাহার পরে হাত নাড়িয়া ঘরের সমস্ত লোককে বাহির করিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে কহিল, আমি কতক্ষণ এমন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি ঠাকুরঝি?

বিন্দু কহিল, পরশু সকালে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে বৌ, এর মধ্যে আর ত তোমার হুঁস হয় নি।

পরশু! কমলা একবার চমকাইয়া উঠিয়াই স্থির হইল। তাহার পরে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রকার সাড়া না পাইয়া বিন্দু শঙ্কিত-চিত্তে তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ডাকিল, বৌ!

কমলা মুখ তুলিল না, কিন্তু সে সাড়া দিল। কহিল, ভয় ক'র না ঠাকুরঝি, আমি আর অজ্ঞান হব না।

সে যে অন্তরের মধ্যে আপনাকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, বিন্দু তাহা বুঝিল। তাই সেও ধৈর্য্য ধরিয়া মৌন হইয়া রহিল।

আরও কিছুক্ষণ এভাবে বসিয়া থাকিয়া কমলা কথা কহিল; বলিল, তুমি যে আমাকে নিয়ে এই দুদিন ব'সে আছ ঠাকুরঝি, আমার সেবা করতে কি ক'রে তোমার প্রবৃত্তি হ'ল? আমি নিজে ত কখন এমন করতে পারতাম না।

বিন্দু কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কেন প্রবৃত্তি হবে না বৌ, তুমি ত আমার পর নও। আমাদের পরিচয় নেই বটে, কিন্তু দাদার মত তুমিও আমার আপনার। তাঁর মত তোমার সেবা করাও ত আমার কাজ। বৌ, তুমি জান না, কিন্তু এসে পর্য্যন্ত আমার কি ক'রে যে দিন কেটেছে, সে ভগবানই জানেন। একবার দাদার ঘর, আর একবার তোমার ঘর। তাঁর কাছে যখন যাই, তখন তোমার জন্যে প্রাণ ছটফট্ করে, আবার তোমার কাছে এসে বসলে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। বিকেল-বেলা থেকে তিনি একটু সুস্থ হয়ে ঘুমুচ্ছেন দেখে তোমার কাছে স্থির হয়ে বসতে পেরেছিলাম। এ যাত্রা দাদা রক্ষে পাবেন, এ আশাই ত কারো ছিল না বৌ!

কমলা বলিয়া উঠিল, বেঁচে আছেন?

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেঁচে আছেন বৈকি। ডাক্তার বললেন, আর ভয় নেই; জ্বর কমে গেছে।

কমলার মুখখানি অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াই তাহা মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। এইবার তাহার আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া বিন্দুর কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল।

বিন্দু চেঁচামেচি করিয়া কাহাকেও ডাকিল না—তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া নিঃশব্দে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। এই মেয়েটির স্বাভাবিক ধৈর্য্য যে কত বড়, সে পরীক্ষা তাহার স্বামীর পীড়ার সময়েই হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যু যাহার স্বামীর শিয়রে আসিয়া বসিয়াও

তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, কমলার জন্যও সে অস্থির হইয়া উঠিল না। কিছুক্ষণে সংজ্ঞা পাইয়া কমলা চোখ মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল, সে কোথায় আছে, তাহার পর সেই কোলের উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রাণপণে নিজের বুক চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে ক্রন্দন এত গাঢ়, এত গুরুভার যে, তাহা বিন্দুর ক্রোড়ের মধ্যেই শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। তাহার এক বিন্দু তরঙ্গও ঘরের বাহিরে কাহারও কানে পৌঁছিল না। নির্জ্জন বাহিরে রাত্রির আঁধার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল, শুধু স্বল্পালোকিত কক্ষের মধ্যে এই দুটি তরুণী রমণী একজন তাহার বিদীর্ণ বক্ষের সমস্ত জ্বালা আর এক-জনের গভীর-শান্ত ক্রোড়ের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল।

ক্রমশঃ শান্ত হইয়া কমলা স্বামীর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেন যে নিজে গিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না তাহা বিন্দু কিছুতেই ভাবিয়া পায় নাই। একবার এমনও ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছিল, হয়ত বড়লোকদের এমনই শিক্ষা এবং সংস্কার। সেবা-শুশ্রূষার ভার চাকর-দাসীদের উপর দিয়া বাহির হইতে খবর লওয়াই তাহাদের নিয়ম। হঠাৎ কমলা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ঠাকুরঝি, তোমার দাদার জ্ঞান হ'লে আমাকে কি একবারও খোঁজ করেন নি?

একবার করেছিলেন, বলিয়াই বিন্দু হঠাৎ থামিয়া গেল। কমলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়া শুধু উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বিন্দু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দাদার জ্ঞান হ'লে তিনি আমাকে, তুমি মনে ক'রে গলা ধ'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, বল কমলা, এ কাজ তুমি কর নি? আমি মরেও সুখ পাব না কমলা, শুধু একবার বল, এ কাজ তোমার দ্বারা হয় নি।

কমলা নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে ?

বিন্দু কহিল, আমি ত জানি নে বৌ, তিনি কোন্ কথা জান্‌তে চেয়েছিলেন।

আমি জানি ঠাকুরঝি, তিনি কি জান্‌তে চান, বলিয়া কমলা একেবারে সোজা উঠিয়া বসিল।

বিন্দু কমলার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি সে ঘরে যেয়োনা বৌ।

কেন যাব না ?

ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন, তুমি গেলে ক্ষতি হ'তে পারে।

আমার ক্ষতি আমার চেয়ে ডাক্তার বেশী বোঝে না ঠাকুরঝি, আমি তাঁর কাছেই চল্‌লুম; ঘুম ভেঙ্গে আবার যদি জান্‌তে চান আমাকে ত তার জবাব দিতে হবে ? বলিয়া কমলা বিন্দুর হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া বিনীত-কণ্ঠে কহিল, আমি মাথা সোজা রেখে চল্‌তে পারব না বোন, আমাকে দয়া ক'রে একবার তাঁর কাছে দিয়ে এসো ঠাকুরঝি।

মনে মনে কহিল, ভগবান, হাতের নোয়া যদি এখনো বজায় রেখেচ ঠাকুর, তা হ'লে সত্যি-মিথ্যের বিচার ক'রে আর তা কেড়ে নিয়ো না। দণ্ড আমার গেছে কোথায়—সে ত সমস্তই তোলা রইল। শুধু এই ক'র প্রভু, তোমার সমস্ত কঠিন শাস্তি যাতে হাসি-মুখে মাথায় তুলে নিতে পারি, আমার সেই পথটুকু ঘুচিয়ে দিয়ো না।

স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া কমলা কিছুতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার দুই দিনের উপবাসক্ষীণ দেহ ও ততোধিক দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঘুরিয়া স্বামীর পদতলে পড়িয়া গেল।

কাশীনাথ জাগিয়া ছিল, কে একজন তাহার পায়ের কাছে বিছানার উপর পড়িল, তাহা সে টের পাইল, কিন্তু ঘাড় তুলিয়া দেখিবার সাধ্য ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিল, কে বিন্দু ?

বিন্দু বলিল, না দাদা, বৌ।

কমলা? তুমি এখানে কেন?

বিন্দু জবাব দিল। শিয়রে বসিয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে দাদা।

কাশীনাথ চুপ করিয়া রহিল, বিন্দু পুনরায় কহিল, আজ রাত্রে আস্‌তে আমি মানা করেছিলাম। আমি নিশ্চয় জান্‌তাম দুদিনের পরে এইমাত্র যার জ্ঞান হয়েছে, সে কিছুতেই এ ঘরে ঢুকে নিজেকে সাম্‌লে রাখ্‌তে পারবে না।

স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কমলা নীরবে পড়িয়াছিল, তাহার অবিচ্ছিন্ন তপ্ত অশ্রুর ধারা কাশীনাথ নিজে আপনার শীতল পায়ের উপরে অনুভব করিতেছিল; তাই ধীরে ধীরে কহিল, হাঁ বোন, না এলেই তার ভাল ছিল।

কমলার প্রতি চাহিয়া বিন্দুর নিজের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, আঁচলে মুছিতে মুছিতে বলিল, সে ভাল কি কেউ পারে দাদা? তুমি ভাল হয়ে ওঠো, কিন্তু এই দু'টো দিন বৌয়ের যে কেমন ক'রে কেটেচে সে আমি জানি আর ভগবান জানেন। নিজেও বোধ করি জানে না।

ভগবানের নামে কাশীনাথ চোখ বুজিয়া তাহার বাহিরের দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে ফিরাইয়া অন্তরের দিকে প্রেরণ করিল। যেখানে বিশ্বের সমস্ত নর-নারীর অন্তর্যামী চিরদিন অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার শ্রীচরণে যেন এই প্রশ্ন নিবেদন করিয়া দিয়া সে মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর চোখ চাহিয়া কহিল, আমার প্রাণের আর কোন আশঙ্কা নেই কমলা, উঠে ব'সো—

বিন্দু কহিল, দাদা, তুমি আমার কাছে যে কথা জান্‌তে চেয়েছিলে বৌ তার উত্তর দিতে এসেচে।

কাশীনাথের পাংশু ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল ; কহিল, আর কারুকে কোন জবাব দিতে হবে না বিন্দু, যে দুদিন ও অচেতন হয়ে পড়েছিল, তার মধ্যে আমার সমস্ত জবাব পৌঁছে গেছে ! বলিয়া বাঁ হাতে ভর দিয়া কাশীনাথ উঠিয়া বসিল। ডান হাতে কমলার মাথাটি জোর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিল, কমল !

কমলা সাড়া দিল না, তেমনি সজোরে পায়ের উপর মুখ চাপিয়া পড়িয়া রহিল, তেমনি তাহার দুচক্ষু বহিয়া প্রস্রবণ বহিতে লাগিল।

বিন্দু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তুমি উঠো না দাদা, ডাক্তার বলেন, আবার যদি—

কাশীনাথ হাসিমুখে কহিল, ডাক্তার যাই বলুন বোন, আমি তোদের বল্‌চি আর ভয় নেই, এ যাত্রা আমাকে তোরা ফিরিয়ে এনেচিস্।

তার পরে কমলার রুক্ষ চুলগুলি হাতের মধ্যে লইয়া ক্ষণকাল নীরবে নাড়া-চাড়া করিয়া কাশীনাথ পুনরায় শুইয়া পড়িল।

আলো ও ছায়া

১

প্রথমেই যদি তোমরা ধরিয়া ব'স, এমন কখ্খনো হয় না, তবে ত আমি নাচার। আর যদি বল হইতেও পারে—জগতে কত কি যে ঘটে, সবই কি জানি? তা হ'লে এ কাহিনী পড়িয়া ফেল, আমার বিশ্বাস তাহাতে কোন মারাত্মক ক্ষতি হইবে না। আর গল্প লিখিতে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা হয় না যে, সবটুকু খাঁটি সত্য বলিতে হইবে। হ'লই বা দু-এক ছত্র ভুল, হ'লই বা একটু আধটু মতভেদ—এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়? তা নায়কের নাম হইল যজ্ঞদত্ত মুখুজ্যে—কিন্তু সুরমা বলে আলোমশাই। নায়িকার নাম ত শুনিলে, কিন্তু যজ্ঞদত্ত তাকে বলে ছায়াদেবী! দিন-কতক তাহাদের ভারি কলহ বাধিয়া গেল, কে যে আলো—কে যে ছায়া, কিছুতেই মীমাংসা হয় না, শেষে সুরমা বুঝাইয়া দিল, এটা তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে আসে না যে, তুমি না থাকিলে আমি কোথাও নাই—কিন্তু আমি না থাকিলে তুমি চিরকাল চিরজীবী; তাই তুমি আলো, আমি ছায়া।

যজ্ঞদত্ত হাসিল, এক তরফা ডিগ্রী পেতে চাও-কর, কিন্তু বিচারটা কোন কাজের হ'ল না।

সুরমা। খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, চমৎকার হয়েছে, আলোমশাই আর ঝগড়া করতে হবে না। তুমি আলোমশাই, আমি শ্রীমতী ছায়াদেবী।

বলিতে বলিতে ছায়াদেবী নানারূপে আলোমশাইকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

গল্পের এতটুকু ত হ'ল! কিন্তু এইবার তোমাদের সঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ না বাধিয়া গেলে বাঁচি! তুমি কহিবে, ইহারা স্ত্রী-পুরুষ, আমি কহিব, স্ত্রী-পুরুষ বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী নয়। নিশ্চয় তুমি চোখ রাঙাইবে, তবে কি অবৈধ প্রণয়? আমি বলিব, খুব শুদ্ধ ভালবাসা। কিছুতেই তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে না, মুখ ভার করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কত বয়স? আমি কহিব, আলোর বয়স তেইশ, আর ছায়ার বয়স আঠার। এর পরেও যদি শুনিতে চাও, আরম্ভ করিতেছি।

যজ্ঞদত্তের ছোট করিয়া দাড়ি ছাঁটা, চোখে চশমা, মাথায় ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ, পরণে কুঞ্চিত ঢাকাই কাপড়, শার্টে এসেন্স মাখান, পায়ে মখমলের কাজ করা স্লিপার—ছায়া স্বহস্তে ফুল তুলিয়া দিয়াছে। লাইব্রেরীতে একঘর পুস্তক, বাটীতে বিস্তর দাস-দাসী। টেবিলের ধারে বসিয়া যজ্ঞদত্ত পত্র লিখিতেছিল। সম্মুখে মস্ত মুকুর। পর্দ্দা সরাইয়া ছায়াদেবী সাবধানে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা, চুপি চুপি চোখ টিপিয়া ধরে; পিঠের কাছে আসিয়া হাত বাড়াইতে গিয়া সম্মুখে দর্পণে নজর পড়িল। দেখিল, যজ্ঞদত্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। সুরমাও হাসিয়া ফেলিল; বলিল, কেন দেখে ফেল্‌লে?

যজ্ঞ। সেটা কি আমার দোষ?

সুরমা। তবে কার?

যজ্ঞ। অর্দ্ধেকটা তোমার, আর অর্দ্ধেকটা ঐ আরসিখানার।

সুরমা। এখনই আমি ওটা ঢেকে দেব!

যজ্ঞ। তা দিও, কিন্তু বাকিটার কি হবে?

সুরমা। বার-দুই নড়িয়া চড়িয়া কহিল, আলোমশাই?

যজ্ঞ। কেন ছায়াদেবী?

সুরমা। তুমি রোগা হয়ে যাচ্চ কেন?

যজ্ঞ। তা-ত আমার বিশ্বাস হয় না।

সুরমা। তুমি খাও না কেন?

যজ্ঞদত্ত হাসিয়া উঠিল—সুরো, কোন্দল কর্ত্তে এসেছ?

সুরমা। হুঁ।

যজ্ঞ। আমি তাতে রাজি নই।

সুরমা। তুমি বিয়ে করবে না কেন?

যজ্ঞ। সে জবাব ত রোজই একবার ক'রে দিয়ে এসেচি!

সুরমা। না, কর্ত্তেই হবে।

যজ্ঞ। সুরো, তুমি একটি বিয়ে কর না কেন?

সুরমা যজ্ঞদত্তের হাত হইতে পত্রখানি কাড়িয়া লইয়া কহিল, ছিঃ, বিধবার কি বিয়ে হয়?

যজ্ঞদত্ত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কে জানে? কেউ বলে হয়, কেউ বলে হয় না।

সুরমা। তবে আমাকে এ নিমিত্তের ভাগী করবার চেষ্টা কেন?

যজ্ঞদত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে কি চিরকাল শুধু আমারই সেবা ক'রে কাটাবে?

হুঁ, বলিয়া সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যজ্ঞদত্ত অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল, সুরো, কি তোমার মনের সাধ, আমাকে খুলে বলবে না?

সুরমা। আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দাও।

যজ্ঞ। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

সুরমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—দক্ষিণে ও বামে বার-দুই মাথা নাড়িতে গিয়া চোখের জল উৎসের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

২

সুরমা। যজ্ঞদাদা, সেই গল্পটা আবার বল না ?

যজ্ঞ। কোন্‌টা সুরো ?

সুরমা। সেই যে আমাকে যবে বৃন্দাবনে কিনেছিলে। কত টাকায় কিনেছিলে গো ?

যজ্ঞ। পঞ্চাশ টাকায়। আমার তখন আঠার বছর বয়স। বি-এ একজামিন দিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাই। মা তখন বেঁচে, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। একদিন দুপুর-বেলায় মালতী-কুঞ্জের ধারে একদল বৈষ্ণবী গান গাইতে আসে, তারই মধ্যে প্রথম তোমাকে দেখ্‌তে পাই, যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়ে জগৎটাকে এমন সুশ্রী দেখতে হয় যে, শুধু নিজের দুটি চোখে সে মাধুর্য্য সবটুকু উপভোগ কর্ত্তে পারা যায় না। সাধ হয়, মনের মতন আর দুটি চোখ এমনি ক'রে এক সাথে এমনি শোভা সম্ভোগ কর্ত্তে পারে যদি তাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারি—ও কি সুরমা, কাঁদ্‌চ যে ?

সুরমা। না—তুমি বল।

যজ্ঞ। তুমি তখন তের বছরের নবীন বৈষ্ণবী, হাতে মন্দিরা, গান গাইছিলে।

সুরমা। যাও—আমি বুঝি গান গাইতে পারি ?

যজ্ঞ। তখন ত পার্‌তে, তার পর অনেক পরিশ্রমে তোমাকে পাই, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, বালবিধবা। মা তোমার তীর্থে এসে আর ফিরে যেতে পারেন নি—স্বর্গে গিয়েছেন। আমার মার কাছে তোমায় এনে দিই, তিনি বুকে তুলে নিলেন—তার পর মৃত্যুকালে আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

সুরমা। যজ্ঞদাদা, তোমার বাড়ী কোথায় ?

যজ্ঞ। শুনেছি, কৃষ্ণনগরের কাছে।

সুরমা। আমার আর কেউ নেই?

যজ্ঞ। আমি আছি, তাই যে তোমার সব সুরমা।

সুরমার চক্ষু আবার জলে ভিজিয়া আসিল, কহিল, তুমি আমাকে আবার বেচতে পার?

যজ্ঞ। না, তা পারি না। নিজেকে না বেচে ফেল্‌লে উটি কিছুতেই হ'তে পারে না। সুরমা কথা কহিল না, তেমনি ভাবে সজল-নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি দাদা, আমি ছোট বোন—আমাদের দুজনার মাঝখানে একটি বৌ আন না দাদা।

যজ্ঞ। কেন বল দেখি?

সুরমা। সমস্ত দিন ধ'রে সাজিয়ে-গুজিয়ে তাকে আমি তোমার কাছে বসিয়ে রাখ্‌ব।

যজ্ঞ। তা কি প্রাণধ'রে পার্‌বে?

সুরমা। মুখ তুলিয়া চোখের উপর চোখ পাতিয়া কহিল, আমি কি তেমনি অধম যে হিংসা কর্‌ব?

যজ্ঞ। হিংসা নাই কর্‌লে, কিন্তু নিজের স্থানটি বিলিয়ে দেবে?

সুরমা। বিলিয়ে কেন দিতে যাব! আমি রাজা, রাজাই থাক্‌ব, শুধু একটি মন্ত্রী বাহাল কর্‌ব, দুজনে মিলে তোমার রাজ্যটা চালাতে আমোদ হবে।

যজ্ঞ। দেখ ছায়া, বিবাহে প্রবৃত্তি নেই, কিন্তু তোমার যদি একজন সাথীর বড় প্রয়োজন হয়ে থাকে ত বিবাহ কর্‌ব।

সুরমা। হাঁ, নিশ্চয় কর, খুব আমোদ হবে;—দুজনে খুব মনের সুখে দিন কাটাব। মনে মনে কহিল, তিনি কুলে আমার কেউ নাই,

আমার মনে অপমান তাও নাই, কিন্তু তুমি কেন আমাকে নিয়ে বিশ্বের কলঙ্ক কুড়াবে? দেবতা আমার! তুমি বিবাহ কর, তোমার মুখ চেয়ে আমার সব সইবে।

৩

কলিকাতায় প্রতিবাসীর খবর অনেকে রাখে না। অনেকে আবার খুব রাখে। যাহারা রাখে, তাহারা বলে, যজ্ঞদত্ত এম-এ পাশ করুক, কিন্তু বয়াটে ছেলে। ইসারায় তাহারা সুরমার কথাটা উল্লেখ করে! সুরমা ও যজ্ঞদত্ত মাঝে মাঝে তাহা শুনিতে পায়। শুনিয়া দুইজনে হাসিতে থাকে।

কিন্তু তুমি ভাল হও আর মন্দ হও, বড়মানুষ হইলে তোমার বাড়ীতে লোক আসিবেই, বিশেষ মেয়েমানুষ। কেহ বা বলে, সুরমা, তোমার দাদার বিয়ে দাও না?

সুরমা। দাও না দিদি, একটি ভাল মেয়ে খুঁজে পেতে।

যে সুরমার সখী সে হাসিয়া ফেলে—তাই ত, ভাল মেয়ে মেলা শক্ত, তোমার রূপে যার চোখ ভরে আছে—তার—

দূর, পোড়ারমুখি! বলিতে বলিতে কিন্তু সুরমার সমস্ত মুখমণ্ডল স্নেহ ও গর্ব্বে রঞ্জিত হইয়া উঠে।

সে দিন দুপুর-বেলা ঝুপ ঝাপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সুরমা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, একটি মেয়ে পছন্দ করে এলাম।

যজ্ঞদত্ত। আঃ, একটা দুর্ভাবনা গেল। কোথায় বল দেখি?

সুরমা। ও-পাড়ার মিত্তিরদের বাড়ী।

যজ্ঞদত্ত। বামুন হয়ে কায়েতের ঘরে?

সুরমা। কায়েতের ঘরে কি বামুন থাকতে নেই? তার মা

ও-বাড়ীতে রেঁধে খেত, মেয়েটি শুনেছি ভাল ; দেখে এসে যদি মনে ধরে ত ঘরে আন।

যজ্ঞদত্ত। আমি কি এমনি হতভাগা যে, রাজ্যের ভিখিরী ছাড়া আমার অন্ন জুটবে না।

সুরমা। ভিখিরী কুড়িয়ে আনা কি তোমার নূতন কাজ ?

যজ্ঞদত্ত। আবার !

সুরমা। না যাও, দেখে এস। মনে ধরে ত না ব'ল না।

যজ্ঞদত্ত। মনে কিছুতেই ধরবে না !

সুরমা। ধরবে গো ধরবে—একবার দেখেই এস না।

ছায়াদেবী তখন আলোমশাইকে এমন সাজাইয়া দিল, এত গন্ধ মাখাইয়া মাজিয়া ঘসিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিয়া এমনি ভাবে আরশির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল যে, যজ্ঞদত্তের লজ্জা করিতে লাগিল। ছিঃ, এ যে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

সুরমা। তা হ'ক, দেখে এস।

গাড়ী করিয়া যজ্ঞদত্ত মেয়ে দেখিতে গেল। পথে একজন বন্ধুকেও তুলিয়া লইল। চল, মিত্তির-বাড়ীতে জলযোগ ক'রে আসি।

বন্ধু। তার মানে ?

যজ্ঞদত্ত। সে বাড়ীতে একটা ভিখিরীর মেয়ে আছে। তাকে বিয়ে কর্ত্তে হবে।

বন্ধু। বল কি, এমন প্রবৃত্তি কে দিলে ?

যজ্ঞদত্ত। তোমরা যার হিংসেয় ম'রে যাও তিনিই, সেই ছায়াদেবী।

যজ্ঞদত্ত বন্ধুকে লইয়া মেয়ে দেখিতে ঘরে ঢুকিলেন। মেয়ে কার্পেটের আসনের উপর বসিয়া, পরণে দেশী কাপড়, কিন্তু অনেক খোপপড়া, সুতাগুলা মাঝে মাঝে জালের মত হইয়া গিয়াছে। হাতে বেলোয়ারি

চুড়ি এবং এক জোড়া পাক দেওয়া তাঁহার মত রংয়ের সোণার বালা—মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় ভিতরের গালাটা দেখা যাইতেছে। মাথায় এত তেল যে কপালটা পর্য্যন্ত চক্ চক্ করিতেছে, ব্রহ্মতালুর উপর শক্ত খোঁপাটা কাঠের মত উঁচু হইয়া আছে। দুই বন্ধুতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাসি চাপিয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, কি নাম তোমার?

মেয়েটি বড় বড় কালো চোখ দুটো শান্তভাবে তাহার মুখের প্রতি রাখিয়া কহিল, প্রতুল।

যজ্ঞদত্ত বন্ধুর গা টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, ওহে, গদাধর নয় ত?

বন্ধু ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, জ্যাঠামি ক'রো না, তাড়াতাড়ি পছন্দ করে নাও।

হাঁ, এই নিই—

বেশ—বেশ, কি পড়?

কিছু না।

আরো ভালো।

কাজ-কর্ম্ম কর্ত্তে জান?

প্রতুল মাথা নাড়িল—নিকটে একজন ঝি দাঁড়াইয়াছিল, সে ব্যাখ্যা করিয়া দিল—ভারি কর্ম্মি মেয়ে বাবু, রাঁধা-বাড়া সংসারের কাজ-কর্ম্মে মায়ের হাত পেয়েছে। আর মুখে কথাটি নেই—ভারি শান্ত।

তা বুঝেছি।

তোমার বাপ বেঁচে নেই।

না।

মাও ম'রে গেছেন?

হাঁ।

যজ্ঞদত্ত দেখিল এই হাবা মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে।

—তোমার কি কেউ নেই?

না।

আমার বাড়ী যাবে?

সে ঘাড় নাড়িল, হুঁ। এই সময় জানালার দিকে নজর পড়ায় সে দেখিল খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দুটো কালো চোখ যেন অগ্নি বর্ষণ করিতেছে, ভয় পাইয়া সে বলিল, না।

বাহিরে আসিয়া মিত্তির মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ।

কেমন দেখলেন?

বেশ।

বিবাহের তবে দিন স্থির হোক।

হোক।

৪

বার-তের বৎসরের বালকের হাত হইতে কোন নির্দ্দয় রসহীন অভিভাবক তাহার অর্দ্ধপঠিত কৌতুকপূর্ণ নভেলটা টানিয়া লুকাইয়া রাখিয়া দিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, ভিতরের প্রাণটা ব্যাকুলভাবে সেই শুষ্কমুখ শঙ্কিত বালককে এঘর ওঘর ছুটাইয়া লইয়া বেড়ায়, ভয়ে ভয়ে তীব্র চক্ষু দুটি শুধু যেমন সেই প্রিয় পদার্থটিকে আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত এবং বিরক্ত হইয়া থাকে, আর সর্ব্বদাই যেন কাহার উপর রাগ করিতে ইচ্ছা করে, তেমনি ভাবে সুরমা যজ্ঞদত্তের জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কি যেন কি একটা খুঁজিয়া বাহির করিবে। চেয়ার, বেঞ্চ, সোফা, শয্যা, ঘর, বারান্দা, সবগুলার উপরেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

রাস্তার দিকের একটা জানালাও তাহার পছন্দ হইল না, একবার এটাতে একবার ওটাতে বসিতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত ঘরে ঢুকিলেন।

কি হ'ল আলোমশাই? আলো মহাশয়ের মুখ গম্ভীর।

সুরমা। পছন্দ হ'ল?

যজ্ঞ। হ'ল।

সুরমা। কবে বিয়ে?

যজ্ঞ। বোধ হয়, এই মাসেই।

নিরানন্দ উৎসাহে সুরমা কাছে আসিল, কিন্তু কোনরূপ উপদ্রব করিল না—আমার মাথা খাও, সত্যি বল।

কি বিপদ্, সত্যিই ত বল্‌চি।

আমার মরা মুখ দেখ—বল, পছন্দ হয়েছে?

হাঁ।

হঠাৎ যেন সুরমা আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। বালক-বালিকারা ধমক খাইয়া কাঁদিবার পূর্ব্বে যেমন এদিক ওদিক ঘাড় নাড়িয়া একটা অর্থহীন কথা বলিয়া ফেলে, সুরমা তেমনি ছেলেমানুষটার মত মাথা হেলাইয়া গাঢ়স্বরে কহিল, তবে বলেছিলাম ত—

যজ্ঞদত্ত নিজের ভাবনায় ব্যস্ত ছিল, তাই বুঝিতে পারিল না যে, এ কথার একবারে কোন অর্থ ই নাই, কেন না প্রথমতঃ "পছন্দই হবে" এমন কথা সুরমা কোন কালে উচ্চারণ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ সে নিজেও মেয়ে দেখে নাই বরং এমনটি সে মোটেই আশা করে না যে, এত অল্পে পছন্দ হইবে, এবং এত শীঘ্র সম্বন্ধ পাকা হইবে। তাই সে সমস্ত দিনটা নিজের ঘরে বসিয়া এই কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিল। দুদিন পরে কিন্তু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা বুঝিতে পারিল, কহিল, সুরো এ বিয়ে দিও না দিদি।

সুরমা। বাঃ তা কি হয়? সব যে স্থির হয়ে গেছে।

যজ্ঞ। স্থির কিছুই নয়।

সুরমা। না তা হ'তে পারে না, দুঃখীর মেয়েকে সুখী করবে এটাও ভেবে দেখ, বিশেষ কথা দিয়ে ফেরাবে?

যজ্ঞদত্তের প্রতুলকুমারীর মুখ মনে পড়িল, সহিষ্ণুতা ও শান্তভাবের নিগূঢ় ছায়া যেন সেদিন তাহার কালো চোখ দুটিতে সে দেখিতে পাইয়াছিল—তাই সে চুপ করিয়া রহিল, তবু যজ্ঞদত্ত অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সুরমার কথাই বেশি ভাবিল। বর্ষার দিনে বাদল-পোকাগুলো হঠাৎ যেমন ঘর ভরিয়া দেয় তেমন তাহার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদিগের নিভৃত বাসগহ্বরটা যেমন কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, তেমনি সুরমার মুখের কথাগুলো মনের কোন্ গুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া দলে দলে বাহির হইতে লাগিল, সেইটাই খুঁজিয়া পাইল না। চোখে তার এমনি ঝাপ্সা জাল লাগিয়া রহিল, যে, কোন-ক্রমেই সুরমার মুখখানি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না।

বিবাহ করিয়া যজ্ঞদত্ত বধূ ঘরে আনিল। বিকারগ্রস্ত রোগী ঘরে লোক না থাকিলে যেমন সমস্ত শক্তি এক করিয়া জলের ঘড়াটার পানে ছুটিয়া গিয়া আঁকড়াইয়া ধরে, সুরমা তেমনি করিয়া নূতন বধূকে আলিঙ্গন করিল। নিজের যতগুলি গহনা ছিল পরাইয়া দিল, যতগুলি বস্ত্র ছিল সমস্ত তাহার বাক্সে ভরিয়া দিল। শুষ্কমুখে সমস্ত দিন ধরিয়া বধূ সাজাইবার ধুম দেখিয়া যজ্ঞদত্ত মুখ চূণ করিয়া রহিল। গাঢ় স্বপ্নটা যেন

হয়—কেন না অসহ্য হইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু জাগিয়া স্বপ্ন দেখাটায় যেন দম আটকাইতে থাকে, কিছুতেই সেটা শেষও হয় না—ঘুমও ভাঙ্গে না। মনে হয় একটা স্বপ্ন, মনে হয় একটা সত্য, 'আলো ও ছায়া'র দুজনেরই এই ভাবটা আসিতে লাগিল। একদিন ঘরে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, ছায়াদেবি!

কি যজ্ঞদাদা?

আলোমশাই বল্‌লে না?

মুখ নত করিয়া সুরমা কহিল, আলোমশাই!

যজ্ঞদত্ত দুই হাত বাড়াইয়া কহিল, অনেক দিন কাছে এস নাই—এস।

সুরমা একবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল; পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, বাঃ আমি ত খুব! বৌকে একলা ফেলে এসেছি। বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

রাগের মাথায় যদি হঠাৎ কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের গালে চড় মারা যায়, আর সে যদি শান্তভাবে ক্ষমা করিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে মনটা যেমন খারাপ হইয়া থাকে, তেমনি ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধীর মত তাহারও মনটা ক্রমাগত দমিয়া পড়িতে লাগিল। কেবলি মনে হয়, সে অপরাধ করিয়াছে আর সুরমা প্রাণপণে ক্ষমা করিতেছে।

সুরমা সর্ব্বাভরণা নববধূকে জোর করিয়া তাহার পার্শ্বে বসাইয়া দেয়। সন্ধ্যা হইলেই বাহির হইতে কটু করিয়া তালা বন্ধ করিয়া দেয়। গালে হাত দিয়া যজ্ঞদত্ত ভাবিতে থাকে। বৌও কতক বুঝিতে পারে, সে সেয়ানা মেয়ে নয়, তবুও ত সে নারী; সাধারণ স্ত্রীবুদ্ধিটুকু হইতে ভগবান কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। সেও সারা রাত্রি জাগিয়া থাকে। আজ আট দিনও বিবাহ হয় নাই, এরি মধ্যে যজ্ঞদত্ত একদিন প্রত্যূষে সুরমাকে ডাকিয়া কহিল, সুরো, বর্দ্ধমানে পিসিমাকে বৌ দেখিয়ে আনি।

দামোদর পারে পিসিমার বাড়ী। সেখানে পৌঁছাইয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, পিসিমা, বৌ এনেচি, দেখ।

পিসিমা। ওমা বিয়ে করেছিস্ বুঝি, আহা বেঁচে থাক্। দিব্বি চাঁদপানা বৌ, এইবার মানুষের মত ঘর-সংসার কর্।

যজ্ঞ। সেই জন্যেই ত বুড়ো জোর করে বিয়ে দিলে।

পিসিমা। বুড়ো বুঝি বিয়ে দিয়েছে?

যজ্ঞ। সেই ত দিলে, কিন্তু কপাল মন্দ—বৌ নিয়ে ঘর করা চলে না।

পিসিমা। কেন রে?

যজ্ঞ। জান ত পিসিমা আমার নর গণ বৌয়ের হ'ল রাক্ষস গণ। একসঙ্গে থাক্‌লে গণৎকার বলে বাঁচি না বাঁচি।

পিসিমা। ষাট্ ষাট্, সে কথা—

যজ্ঞ। তখন তাড়াতাড়ি এ সব দেখা হয় নি, এখন ত তোমার কাছে থাক্‌বে, মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাঠাব, তাতে চল্‌বে না পিসিমা?

পিসিমা। হাঁ তা চলে যাবে। পাড়াগাঁয়ে, বিশেষ কষ্ট হবে না। আহা, চাঁদের মত মেয়ে, ডাগর হয়েছে, হ্যাঁরে যজ্ঞ, একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে হয় না?

যজ্ঞ। হ'তে পারে। আমি ভট্টাচার্য্যের মত নিয়ে যা ভাল হয় তোমাকে জানাব।

পিসিমা। তা জানাস্ বাছা।

সন্ধ্যার সময় বৌকে কাছে ডাকিয়া যজ্ঞদত্ত কহিল, তবে তুমি এইখানেই থাক। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।—যা তোমার যখন দরকার হবে আমাকে জানিয়ো।—আচ্ছা।—তুমি চিঠি লিখ্‌তে জান? —না।—তবে কি করে জানাবে? নববধূ গৃহপালিতা হরিণীর মত চক্ষু দুটি

স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। যজ্ঞদত্ত মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

পিসির বাটীতে বৌ ভোরে উঠিয়া কাজ করিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে সে শিখে নাই, নূতন লোক হইলেও সে পরিচিতের মত ঘরকন্নার কাজ করিতে সুরু করিল। দুই-চার দিনেই পিসিমা বুঝিলেন, এমন মেয়ে সবাই গর্ভে ধরে না।

বৌয়ের অনেক গহনা, পাড়া শুদ্ধ ঝেঁটিয়ে লোক তা দেখ্‌তে আসে! —কে দিয়েছে গা? তোমার বাপ? —না, বাপ মা আমার নাই, ঠাকুরঝি দিয়েছেন। দু-একজন সমবয়সীর সহিত ভাব হইলে তাহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তোমার ঠাকুরঝি বুঝি খুব বড় লোক? —হ্যাঁ! —সব গহনা তারি? —সব। তাঁর দরকার নেই, তিনি বিধবা, এসব পরেন না। —কত বয়স বৌ? —আমাদের চেয়ে কিছু বড়। তিনি জোর করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। —তোমার বর বুঝি তাঁর খুব অনুগত? —হাঁ, তিনি সতীলক্ষ্মী, সবাই তাঁকে ভালবাসে।

৬

উপরের জানালা হইতে সুরমা দেখিল, যজ্ঞদত্ত বাড়ী ফিরিয়া আসিল কিন্তু সঙ্গে বৌ নাই। ঘরে প্রবেশ করিলে কহিল, যজ্ঞদাদা, বৌকে কোথায় রেখে এলে?

পিসির বাড়ী।

সঙ্গে আন্‌লে না কেন?

থাক্ কিছুদিন পরে আন্‌লেই হবে।

কথাটা সুরমার বুকে বিঁধিল। দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল।

প্রিয়জনের সহিত তর্ক করিতে গিয়া হঠাৎ বচসা হইয়া গেলে যেমন দুই-জনেই কিছুক্ষণ ক্ষুণ্ণমনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, এ দুইজনও কিছুদিন তেমনি চুপ-চাপ দিন কাটাইতে লাগিল। সুরমা কহে, নেয়ে খেয়ে নাও অনেক বেলা হ'ল। যজ্ঞদত্ত বলে, হাঁ এই যাই। এমন করিয়াও কিছুদিন কাটিল। এক সঙ্গে ঘর করিতে গিয়া চিরদিন এভাবে চলে না, তাই আবার মিল হইতে লাগিল। যজ্ঞদত্ত আবার আদর করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—ও ছায়াদেবী? ছায়া কিন্তু আর আলোমশাই বলে না। যজ্ঞদাদা বলে, কখন বা শুধু দাদা বলিয়াই ডাকে।

সুরমা একদিন কহিল, দাদা, প্রায় তিনমাস হ'তে চল্‌ল, এইবার বৌকে আন। যজ্ঞদত্ত কাটাইয়া দেয়, হাঁ তা হবে এখন। মনের ভাব বুঝিয়া সুরমা চুপ করিয়া থাকে।

পিসির পত্র মাঝে মাঝে আসে। পিসি লেখেন, বৌয়ের ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছে, চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। মনের ভাব বুঝিয়া যজ্ঞদত্ত কতকগুলো টাকা বেশি করিয়া পাঠাইয়া দেয়। আর মাস-খানেক কোনও কথা উঠে না।

এমন সময় একদিন হঠাৎ চিঠি আসিল যে পিসি মরিয়া গিয়াছে। যজ্ঞদত্ত বর্দ্ধমানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সুরমা মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিল, বৌকে নিয়ে এস।

বর্দ্ধমানে পিসির শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গেলে একদিন দুপুর-বেলা যজ্ঞদত্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়ী যাইবার কথা ভাবিতেছিল। উঠানে একটা ধানের মরাইয়ের পাশে নূতনবৌ দাঁড়াইয়া, চোখে পড়িল। চোখোচোখি হইবামাত্র সে হাত দিয়া ইসারা করিয়া ডাকিল।

যজ্ঞদত্ত স্ত্রীর নিকটে পৌঁছিল।

কি?

আপনাকে কিছু বলব!

বেশ ত বল।

নূতনবৌ ঢোক গিলিয়া কহিল, একদিন আপনি বলেছিলেন যদি আমার কোন দরকার হয়—

যজ্ঞদত্ত। বেশ ত কি দরকার বল ?

বৌ। বাড়ীতে সবাই বলাবলি কচ্ছিলেন, আমি বড় অলক্ষণা, তাই এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করে না।

যজ্ঞদত্ত। কোথায় থাকতে চাও ?

বৌ। কলকাতায় যদি কোন ভদ্র পরিবারে স্থান পাই—আমি ত সব কাজ কত্তে পারি।

যজ্ঞদত্ত। তোমার নিজের বাড়ীতে যাবে ?

বৌ। আমার নিজের বাড়ী ? সে আবার কোথায় ? তাঁরা কি আর থাকতে দেবেন ?

যজ্ঞদত্ত হাত দিয়া স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, আমার বাড়ীতে যাবে ?

বৌ। যাব।

যজ্ঞদত্ত। সুরমা তোমার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছে।

সুরমার কথায় তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—ঠাকুরঝি আমায় মনে করেন ?

যজ্ঞদত্ত। করেন বই কি।

বৌ। তবে নিয়ে চলুন।

জগতে এক প্রকমের লোক আছে, তাহারা পরের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার বুদ্ধি কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু এমন একটা সহজ বুদ্ধি রাখে যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিজের সম্বন্ধে অপরের পরামর্শ মোটেই প্রয়োজন বোধ করে না। নূতনবৌটি এই শ্রেণীর। সে নিজের

কথা নিজেই ভাবে—পরকে জিজ্ঞাসা করে না। ভাবিয়া কহিল, আপনাদের অকল্যাণ করবার বড় ভয় আমার, কিন্তু থাকি বা কোথায়? না হয়, আমি নীচেই থাক্‌ব, সব কাজ-কর্ম্ম করতে নীচে থাকাই সুবিধের।

যজ্ঞ। উপরে কি তোমার থাকবার ঘর নেই?

আছে, কিন্তু নীচের ঘরেই বেশ থাক্‌বো। যজ্ঞদত্ত আর কোন কথা কহিল না। ভাবিতে লাগিল যে, খুব বোকার মত ত এ কথাগুলো নয়, এবং কয়েকবার মনে করিল, বলিয়া ফেলি যে সে অলক্ষণা নহে, রাক্ষস গণ প্রভৃতি মিথ্যা কথা। কিন্তু মিথ্যা কথার কারণটা কি তা কি করিয়া বলা যায়। বিশেষ বাড়ী গিয়া সে তাহার অতীত এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারে যে বেশ মিল করিয়া তুলিতে পারিবে সে ভরসাও মনে করিতে পারিল না।

৭

সুরমা দেখিল বৌ আসিয়াছি। উগ্র নেশার প্রথম ঝোঁকটা কাটাইয়া দিয়া সে স্থির হইয়াছে। তাই বৌ দেখিতে বাড়াবাড়ি করিল না। শান্ত ধীরভবে প্রিয় সম্ভাষণ করিল, মৌখিক নহে, অন্তরগত মঙ্গলেচ্ছা তাহার শুষ্ক মুখের উপর জ্যোতি ফিরাইয়া আনিল।—বৌ, কই ভাল ছিলে না ত? বৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, মাঝে মাঝে জ্বর হ'ত। সুরমা তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া বলিল, এখানে চিকিৎসা হ'লেই সব ভাল হ'য়ে যাবে।

দুপুর-বেলা সুরমা সংবাদ পাইল যে বৌয়ের জন্য নীচের ঘর পরিষ্কার হইতেছে; অপমানে তাহার চোখে জল আসিল। সম্বরণ করিয়া যজ্ঞদত্তের কাছে গিয়া বলিল, দাদা, বৌ কি নীচে শোবে? তুমি কিছু বলবে না?

—আর কি বল্‌ব? যার যা খুসী তা করুক।

সুরমা লজ্জা ও ধিক্কারে আপনাকে শাসন করিতে পারিল না, সম্মুখেই কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। উপরের গোলযোগটা কিন্তু নীচে পৌঁছিল না।

নূতনবৌ নূতন করিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে সুরমার সব কাজগুলি নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শুধু উপরে যায় না—স্বামীর সহিত দেখা করে না। ক্রমে সুরমাও উপর ছাড়িয়া দিল। বৌ প্রফুল্ল গম্ভীর মুখে কাজ করিত, সুরমা পাশে বসিয়া থাকিত। একজন দেখাইত কর্ম্ম করিয়া কত সুখ, অপর বুঝিত কর্ম্মস্রোতে অনেক দুঃখ ভাসাইয়া দিতে পারা যায়। দুজনের কেহই বেশি কথা কহে না, তাহাদের সহানুভূতি ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে নূতন বধূর প্রায় জ্বর হয়, দুই-চারদিন উপবাস থাকিয়া আপনি সারিয়া উঠে। ঔষধে প্রবৃত্তি নাই, ঔষধ খায় না। সে সময়ের কাজ-কর্ম্মগুলা দাস-দাসীতেই করে; সুরমা পারিয়া উঠে না, ইচ্ছা থাকিলেও সামর্থ্যে কুলায় না। সোণার প্রতিমা সুরমা দেবীর এখন সে রং নাই, সে কান্তি নাই, অত লাবণ্য দুই মাসের মধ্যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। বৌ মাঝে মাঝে বলে, ঠাকুরঝি, তুমি দিন দিন এমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন?

আমি? আচ্ছা বৌ, শরীরটা ভাল কর্‌বার জন্যে আমি যদি বিদেশে যাই, তোমার কষ্ট হবে না ত?

হবে বৈকি।

তবে যাব না?

না ঠাকুরঝি যেয়ো না, তুমি ঔষধ খেয়ে এখানেই ভাল হও। সুরমা স্নেহভরে তাহার ললাট চুম্বন করিল।

একদিন সুরমা যজ্ঞদত্তের খাবার সাজাইতেছিল। যজ্ঞদত্ত তাহার মলিন কৃশ মুখখানি সতৃষ্ণ চক্ষে দেখিতেছিল। সুরমা মুখ তুলিল, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মলে হয় মলেই বাঁচি।

কেন? বলিতেই সুরমার চক্ষে জল আসিল। ভয় হয় আর কতদিন এ প্রাণটাকে ব'য়ে বেড়াতে হবে। বন্দুকের গুলি খাইয়া বনের পশু যেমন মাটি ছাড়িয়া আকাশে পলাইবার জন্য প্রাণপণে লাফাইয়া উঠে, কিন্তু আকাশ তাহার কেহ নয়, তাই সেই আশ্রয়শূন্য মরণাহত জীব শেষে চিরদিনের আশ্রয় পৃথিবীকেই জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণত্যাগ করে, তেমনি ছটফট করিয়া সুরমা প্রথমে আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল, তারপর তেমনি করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল, যজ্ঞদাদা, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার শত্রু, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে, তুমি সুখী হও। তখনি হয় ত দাসী আসিয়া পড়িবে, যজ্ঞদত্ত হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিল। সস্নেহে অশ্রু মুছাইয়া কহিল, ছিঃ ছেলেমানুষী ক'র না। অশ্রু মুছিতে মুছিতে সুরমা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

৮

তারপর একদিন সুরমা বৌকে টানিয়া কাছে লইয়া কহিল, বৌ, দাদা কি তোমাকে কখন কিছু বলেছেন?

বৌ সহজভাবে উত্তর দিল, কি আবার বল্‌বেন?

তবে তুমি কখন তাঁর কাছে যাও না কেন? তোমার কি যেতে ইচ্ছা করে না?

বৌয়ের প্রথমটা লজ্জা করিতে লাগিল, পরে মুখ নত করিয়া কহিল, করে দিদি, কিন্তু যাবার ত জো নেই।

কেন বৌ?

তোমার কি মনে নেই?

কই না।

ওঃ, তুমি বুঝি ভুলে গেছ ঠাকুরঝি, আমার যে রাক্ষস গণ, ওঁর নর গণ।

কে বলেছে?

উনিই পিসিমাকে বলেছিলেন, তাইতে—

সুরমা শিহরিয়া উঠিল—এ যে মিছে কথা বৌ।

মিছে কথা?

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে সুরমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সুরমা বার বার শিহরিয়া উঠিল—মিছে কথা বৌ, ভয়ানক মিছে কথা।

আমার বিশ্বাস হয় না, উনি মিছে কথা বল্‌বেন। সুরমা আর সহিতে পারিল না। দুই বাহুর মধ্যে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৌ আমি মহাপাতকী।

বধূ আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, কেন ঠাকুরঝি?

উঃ তা আর শুন্‌তে চেয়ো না। আমি বল্‌তে পার্‌ব না।

ঝড়ের মত সুরমা যজ্ঞদত্তের সম্মুখে আসিয়া পড়িল—বৌকে এমন ক'রে ঠকিয়ে রেখেছ, উঃ কি ভয়ানক মিথ্যাবাদী তুমি! যজ্ঞদত্ত অবাক হইয়া গেল।

ও কি সুরো!

কৃতবিদ্য তুমি, ছি ছি তোমার লজ্জা হইয়া উচিত। যজ্ঞদত্ত অর্থ বুঝিল না শুধু কটু কথা শুনিতে লাগিল।—কি ভেবে বিয়ে করেছিলে? কি ভেবে ত্যাগ ক'রে আছ? আমার জন্য? আমার মুখ চেয়ে এই প্রতারণা করে আসছ?

সুরমা পাগল হ'য়ে গেলে?

পাগল আমি? তোমার চেয়ে আমার জ্ঞান আছে, দাও আমাকে কোথাও পাঠিয়ে। সুরমার চক্ষু রক্তবর্ণ, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, এক দণ্ডও আমি থাকৃতে চাই না, ছিঃ ছিঃ!

যজ্ঞদত্ত চীৎকার করিয়া কহিল, কি বল্‌চ ?

বল্‌চি তুমি মিথ্যাবাদী—প্রতারক !

নিমেষে যজ্ঞদত্তের মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল ; অকারণে মনে হইল তাহার ভিতরের অন্তরটা বাহির হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ডাকিতেছে। জ্ঞানশূন্য হইয়া সে টেবিলের উপরিস্থিত ভারি "রুলার" তুলিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, আমি অধম, আমি প্রতারক, আমি মিথ্যাবাদী, এই তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌চি।

বিপুল বলের সহিত যজ্ঞদত্ত তাহার মস্তকে ভীষণ আঘাত করিল। মাথা ফাটিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া রক্তস্রোত বহিল। সুরমা অস্ফুটে ডাকিল, মাগো! তারপর অচৈতন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। যজ্ঞদত্ত তাহা দেখিল, দেখিল তার সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিতেছে, চোখের ভিতর রক্ত ঢুকিয়া সমস্ত ঝাপসা বোধ হইতেছে। সে উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিল, আর কেন ? এই সময় পিছন হইতে কে ধরিয়া ফেলিল। ফিরিয়া দেখিল স্ত্রী, কাঁদিয়া বলিল, তুমি ? স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া সেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সুরমা যেমন করিয়া নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসিল, নূতনবধূ তাহাতে আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইয়া নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিল, সব কাণ্ড দেখিল। অনেকখানি সত্য তাহার মাথার ভিতর সূর্য্যের আলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইল, তাহারও বক্ষ-স্পন্দন দ্রুত হইয়া আসিয়াছিল, চক্ষের বাহিরে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইতেছিল কিন্তু সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বিপদের সময় স্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিল।

৯

ছয় দিন পরে ভাল করিয়া জ্ঞান হইলে, সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কেমন আছেন? দাসী কহিল, ভাল আছেন।—আমি দেখে আস্‌ব! কিন্তু উঠিতে গিয়া আবার শুইয়া পড়িল। দাসী কহিল, তুমি বড় দুর্ব্বল, তাতে জ্বর হয়েছে, উঠো না, ডাক্তার বারণ করেছে। সুরমা আশা করিল যজ্ঞদাদা দেখিতে আসিবে, বৌ দেখিতে আসিবে। একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তবু কেহ আসিল না, কেহ খোঁজও লইল না।

জ্বর সারিয়াছে, কিন্তু বড় দুর্ব্বল। উঠিতে চেষ্টা করিলে হয় ত উঠিতে পারিত, কিন্তু বিষম অভিমানে তাহার শয্যাত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। নিজের মনে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত, চোখ মুছিয়া ভাবিত—তাহাদের আলো ও ছায়ার কাহিনী।

দীপ্ত আলো ও গাঢ় ছায়া লইয়া তাহারা খেলা আরম্ভ করিয়াছিল, এখন আলো নিভিয়া আসিতেছে। মধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমে ঝুঁকিয়াছে, গাঢ় ছায়া তাই অস্পষ্ট ও বিকৃত হইয়া প্রেতের মত কঙ্কালসার হইয়াছে। অজানা অন্ধকারের পানে সে ছায়া যেন মিশিয়া যাইবার জন্য ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুরমা ঘুমাইয়া পড়িল।

গায়ের উপর তপ্ত হস্ত রাখিয়া কে যেন ডাকিল, দিদি!

সুরমা উঠিয়া বসিল, এ কি বৌ? চক্ষু তাহার রক্তবর্ণ, মুখ শুষ্ক, ওষ্ঠদ্বয় যেন কালিমাখা।—কেন বৌ কি হয়েচে তোমার?

কি হয়েছে আমার? তুমি আমাকে এ বাড়ীতে এনেছিলে তাই বল্‌তে এসেছি দিদি, ছুটি দাও আমাকে। আমি যাব—

কেন দিদি, কোথা যাবে? নূতনবধূ সুরমার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সুরমা দেখিল তাহার দেহ অগ্নির মত উত্তপ্ত।—একি! এ যে বড় জ্বর হয়েছে। এমন সময় একজন দাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিল, দিদি, বৌ কোথা গেল? ওমা জ্বরের ঝোঁকে পালিয়ে এসেছেন। আজ আট দিন বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন। মাগো! কি করে এলেন?

আট দিন জ্বর! ডাক্তার দেখচে?

কেউ না দিদি, কেউ না, পরশু দিন সকাল-বেলাও বৌমা এক ঘণ্টা কলতলায় মাথা পেতে বসেছিলেন, এত মানা করলুম, কিছুতে শুন্‌লেন না।

* * *

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরমা যজ্ঞদত্তের ঘরে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল, দাদা, বৌ আর বাঁচে না।

বাঁচে না! কি হয়েছে?

আমার ঘরে এসে দেখ দাদা, বৌ বুঝি বাঁচে না।

দুই-তিন জন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল, প্রবল বিকার। সমস্ত রাত্রি বিফল পরিশ্রম করিয়া তাহারা ভোর-বেলায় চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি যজ্ঞদত্ত মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল, কতবার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, বধূ কিন্তু স্বামীকে চিনিতে পারিল না।

ডাক্তার চলিয়া গেলে যজ্ঞদত্ত কাঁদিয়া উঠিল, বৌ, একবার চেয়ে দেখ, একবার বল ক্ষমা করলে?

সুরমা পায়ের উপর মুখ লুকাইয়া অস্ফুটে বলিল,- বৌদিদি, কেন এ শাস্তি দিয়ে গেলে?

কে কথা কহিবে? সমস্ত মান, অভিমান, তাচ্ছিল্য, অবহেলা সরাইয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে অনন্তে মিলাইয়া গেল।

* * *

সুরমা কহিল, দাদা কোথায়?

দাসী উত্তর করিল, কাল তিনি পশ্চিমে চলে গেছেন।

কবে আসবেন ?

জানিনে বোধ হয় শীগ গির আসবেন না।

আমি কোথায় থাকব ?

সরকারমশায়কে বলে গেছেন, যত ইচ্ছে টাকা নিয়ে তোমার যেখানে খুসী থেকো।

সুরমা আকাশপানে চাহিয়া দেখিল, জগতের আলো নিভিয়া গিয়াছে, সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, একটি তারাও দেখা যায় না। পাশে চাহিয়া দেখিল, সে অস্ফুট ছায়াটিও কোথায় সরিয়া গিয়াছে—চতুর্দ্দিক ঘনান্ধকার। বক্ষ-স্পন্দন তাহার যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে, চক্ষের জ্যোতি ম্লান ও স্থির হইয়া আসিতেছে। দাসী ডাকিল, দিদি!

ঊর্দ্ধনেত্রে সুরমা ডাকিল, যজ্ঞদাদা!

তার পর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

মন্দির

১

এক গ্রামে নদীর তীরে দুঘর কুমোর বাস করিত। তাহারা নদীর মাটী তুলিয়া ছাঁচে ফেলিয়া পুতুল তৈরি করিত, আর হাটে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিত। চিরকাল তাহারা এই কাজ করে, চিরকাল এই মাটীর পুতুল তাহাদিগের পরণের বস্ত্র ও উদরের অন্ন যোগাইয়া থাকে। মেয়েরা কাজ করে, জল তুলে, রাঁধিয়া স্বামী পুত্রকে খাওয়ায় এবং নিবান ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে পোড়া পুতুল বাহির করিয়া আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া চিত্রিত হইবার জন্য পুরুষদের হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

শক্তিনাথ এই কুম্ভকার পরিবারের মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণদেহ এই ব্রাহ্মণকুমার, তাহার বন্ধুবান্ধব, খেলাধূলা, লেখা-পড়া, সব ছাড়িয়া দিয়া এই মাটীর পুতুলের পানে অকস্মাৎ একদিন ঝুঁকিয়া পড়িল। সে বাঁশের ছুরী ধুইয়া দিত, ছাঁচের ভিতর হইতে পরিষ্কার করিয়া মাটী চাঁচিয়া ফেলিত এবং উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্ট চিত্তে পুতুলের চিত্রাঙ্কন কার্য্য কেমন অসাবধানতার সহিত সমাধা হইতেছে, তাহাই দেখিত। কালি দিয়া পুতুলের ভ্রূ, চক্ষু, ওষ্ঠ প্রভৃতি লিখিত হইত। কোনটার ভ্রূ মোটা, কোনটার আধখানা, কাহারো বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। শক্তিনাথ অধীর ঔৎসুক্যে আবেদন করিত, সরকারদাদা, অমন তাচ্ছিল্য ক'রে আঁকচ কেন? সরকারদাদা অর্থাৎ কারিগর সস্নেহে হাসিয়া জবাব দিত, বামুনঠাকুর, ভাল ক'রে আঁকতে গেলে বেশি দাম লাগে, অত কে দেবে, বল? এক পয়সার পুতুল ত আর চার পয়সায় বিকোবে না।

২

এই সহজ কথাটার অনেক আলোচনা করিয়াও শক্তিনাথ আধখানা মাত্র বুঝিয়াছিল। এক পয়সার পুতুল ঠিক এক পয়সায় বিকাইবে, তাহার ভ্রূ থাকুক, আধখানা ভ্রূ নাই থাকুক। দুই চক্ষু সমান অসমান যাই হৌক, সেই এক পয়সা! মিছামিছি কে এত পরিশ্রম করিবে? পুতুল কিনিবে বালক, দুদণ্ড তাহাকে আদর করিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে করিবে—তারপর ভাঙিয়া ফেলিয়া দিবে—এই ত? শক্তিনাথ বাটী হইতে সকাল-বেলা যে মুড়িমুড়কি কাপড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, তাহার ভুক্তাবশিষ্ট এখনো বাঁধা আছে, তাহাই খুলিয়া, অতিশয় অন্যমনস্কভাবে চিবাইতে চিবাইতে ছড়াইতে ছড়াইতে সে তাহাদের জীর্ণ বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। বাটিতে কেহ নাই। ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধ পিতা জমিদার বাটীতে মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করিতে গিয়াছেন। ভিজা আলোচাল, কলা, মূলা প্রভৃতি উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য বাঁধিয়া আনিবেন, তাহার পর পাক করিয়া পুত্রকে খাওয়াইবেন, নিজেও খাইবেন। বাড়ীর উঠান কুঁদফুল, করবীফুল ও সেফালীফুলগাছে পূর্ণ। গৃহলক্ষ্মীহীন বাটীটার সর্ব্বত্রই জঙ্গল; কিছুতে শৃঙ্খলা নাই, কাহারো পারিপাট্য নাই। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মধুসূদন কোনরূপে দিনপাত করেন। শক্তিনাথ ফুল পাড়িয়া, ডাল নাড়িয়া, পাতা ছিঁড়িয়া উঠানময় অন্যমনস্কভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রতিদিন সকাল-বেলা শক্তিনাথ কুমোরবাড়ী যায়। আজকাল সে পুতুলে রং দিবার অধিকার পাইয়াছে। তাহার সরকারদাদা সযত্নে সব চেয়ে ভাল পুতুলটা তাহাকে বাছিয়া দিয়া বলে, নাও দাদাঠাকুর, তুমি চিত্তির কর। দাদাঠাকুর এক বেলা ধরিয়া একটি পুতুল চিত্রিত করে। হয় ত খুব ভালই হয়, তবু এক পয়সার বেশি দাম উঠে

না। সরকারদাদা কিন্তু বাটী আসিয়া বলে, বামুনঠাকুরের চিত্রি করা পুতুলটি দুপয়সায় বিকিয়েছে। শুনিয়া শক্তিনাথের আর আনন্দ ধরে না।

৩

এ গ্রামের জমিদার কায়স্থ। দেব দ্বিজে তাঁহার বাড়াবাড়ি ভক্তি। গৃহদেবতা নিকষ-নির্ম্মিত মদনমোহন বিগ্রহ; পার্শ্বে সুবর্ণরঞ্জিত শ্রীরাধা—অত্যুচ্চ মন্দিরে রৌপ্য সিংহাসনে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবনলীলার কত অপরূপ চিত্র মন্দির-গাত্রে সংলগ্ন। উপরে কিংখাপের চন্দ্রাতপ, তাহাতে শতশাখার ঝাড় দুলিতেছে। এক পার্শ্বে মর্ম্মর বেদীর উপর পূজার উপকরণ সজ্জিত, এবং নিত্যনিবেদিত পুষ্প চন্দনের ঘন সৌরভে মন্দিরাভ্যন্তর সমাচ্ছন্ন। বুঝি, স্বর্গসুখ ও সৌন্দর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে এই পুষ্প ও গন্ধ, পূজার প্রথম উপচার হইয়া আছে, এবং তাহারই সুকোমল সুরভি বায়ুর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া মন্দির বায়ুকে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছে।

৪

অনেক দিনের কথা বলিতেছি। জমিদার রাজনারায়ণবাবু যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়া প্রথম বুঝিলেন যে, এ জীবনের ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে; যে দিন সর্ব্ব প্রথম বুঝিলেন যে, এ জমিদারী ও ধন ঐশ্বর্য্য ভোগের মিয়াদ প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে; প্রথম যে দিন মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চোখ দিয়া অনুতাপাশ্রু বিগলিত হইয়াছিল, আমি সেই দিনের কথা বলিতেছি। তখন তাঁহার এক মাত্র কন্যা অপর্ণা—পাঁচ বৎসরের বালিকা। পিতার পায়ের কাছে

দাঁড়াইয়া এক মনে সে দেখিত, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য চন্দন দিয়া কাল পুতুলটি চর্চ্চিত করিতেছেন, ফুল দিয়া সিংহাসন বেষ্টন করিতেছেন এবং তাহারই স্নিগ্ধ গন্ধ, আশীর্ব্বাদের মত যেন তাহাকে স্পর্শ করিয়া ফিরিতেছে। সেই দিন হইতে প্রতিদিনই এই বালিকা সন্ধ্যার পর পিতার সহিত ঠাকুরের আরতি দেখিতে আসিত এবং এই মঙ্গল উৎসবের মধ্যে অকারণে বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে অপর্ণা বড় হইতে লাগিল। হিন্দুর মেয়ে—ঈশ্বরের ধারণা যেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, সেও তাহাই করিতে লাগিল, এবং পিতার নিতান্ত আদরের সামগ্রী এই মন্দিরটী যে তাহারও বক্ষ-শোণিতের মত, এ কথা সে তাহার সমস্ত কর্ম্ম ও খেলা-ধূলার মধ্যেও প্রমাণ করিতে বসিল। সমস্ত দিন সেই মন্দিরের কাছাকাছি থাকিত এবং একটি শুষ্ক তৃণ বা একটি শুষ্ক ফলও সে মন্দিরের ভিতর পড়িয়া থাকা সহ্য করিতে পারিত না। এক ফোঁটা জল পড়িলে সে সযতনে আঁচল দিয়া তাহা মুছিয়া লইত। রাজনারায়ণবাবুর দেবনিষ্ঠা—লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিত, কিন্তু অপর্ণার দেবসেবা-পরায়ণতা সে সীমাও অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। সাবেক পুষ্পপাত্রে আর ফুল আঁটে না—একটা বড় আসিয়াছে। চন্দনের পুরাতন বাটীটা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোজ্য ও নৈবেদ্যর বরাদ্দ ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি নিত্য নূতন ও নানাবিধ পূজার আয়োজন ও তাহার নিখুঁত বন্দোবস্তের মাঝে পড়িয়া বৃদ্ধ পুরোহিত পর্য্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জমিদার রাজনারায়ণবাবু এ সব দেখিয়া শুনিয়া ভক্তি স্নেহে গাঢ়স্বরে কহিতেন, ঠাকুর আমার ঘরে তাঁহার নিজের সেবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তোমরা কেহ কিছু বলিয়ো না।

যথা সময়ে অপর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। মন্দির ছাড়িয়া এইবার যে তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তাহার মুখের হাসি অসময়ে শুকাইয়া গেল। দিন দেখান হইতেছে, তাহাকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইবে। পরিপূর্ণ বিদ্যুৎ বুকে চাপিয়া বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড যেমন অবরুদ্ধ গৌরবের গুরুভারে স্থির হইয়া কিছুক্ষণ আকাশের গায়ে বর্ষণোন্মুখ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি স্থির হইয়া একদিন অপর্ণা শুনিল যে সেই দেখান-দিন আজ আসিয়াছে। সে পিতার নিকট গিয়া কহিল, বাবা, আমি ঠাকুর-সেবার যে বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম তাহার যেন অন্যথা না হয়। বৃদ্ধ পিতা কাঁদিয়া ফেলিলেন—তাই ত মা! না, অন্যথা কিছুই হবে না। অপর্ণা নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। তাহার মা নাই। সে কাঁদিতে পারিল না; বৃদ্ধ পিতার দুচোখ ভরা জল—সে রাগ করিবে কি করিয়া? তাহার পর যোদ্ধা যেমন করিয়া তাহার ব্যথিত ক্রন্দনোন্মুখ বীর হৃদয় পৌরুষ-শুষ্ক হাসিতে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া অপর্ণা শিবিকারোহণে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অজানা কর্ত্তব্যের শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে গিয়া তাহার মনে পড়িল—পিতার অশ্রু মুছাইয়া আসা হয় নাই। তাহার নিজের হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমাগত তাহার কাছে যেন কত নালিশ করিতে লাগিল। একে তাহার হৃদয় শত ব্যথায় বিদ্ধ, তাহার পর কোথায় কোন্ গ্রামান্তের মন্দির হইতে যখন সন্ধ্যার শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন সেই আজন্ম পরিচিত আরতির আহ্বান শব্দ তাহার কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে নৈরাশ্যের হাহাকার বহন করিয়া আনিল। ছট্‌ফট্ করিয়া অপর্ণা শিবিকার দ্বার

উন্মোচন করিয়া ফেলিল, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিল, এবং ছায়ানিবিড় একটা উচ্চ দেবদারু শিখায় একটা পরিচিত মন্দিরের সমুন্নত চূড়া কল্পনা করিয়া সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার শ্বশুর বাটীর একজন দাসী পিছনেই চলিয়া আসিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, ছি বৌমা, অমন করে কি কাঁদতে আছে মা, শ্বশুর ঘর কে না করে? অপর্ণা দুই হাতে মুখ চাপিয়া রোদন নিবারণ করিয়া পাল্কীর কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়টিতেই মন্দিরের ভিতর দাঁড়াইয়া পিতা রাজনারায়ণ মদনমোহন ঠাকুরের পার্শ্বে ধূপ ধূনার ধূমে ও চক্ষুজলে অস্পষ্ট একখানি দেবীমূর্ত্তির অনিন্দ্যসুন্দর মুখে প্রিয়তমা দুহিতার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

৬

অপর্ণা স্বামীগৃহে। সেথায় তাহার ইচ্ছাহীন স্বামী-সম্ভাষণের ভিতর এতটুকু আবেগ, এতটুকু চাঞ্চল্যও প্রকাশ পাইল না। প্রথম প্রণয়ের স্নিগ্ধ সঙ্কোচ, মিলনের সলজ্জ উত্তেজনা, কিছুই তাহার ম্লান চক্ষু দুটীর পূর্ব্ব দীপ্তি ফিরাইয়া আনিল না। প্রথম হইতেই স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই যেন পরস্পরের কাছে কোন দুর্ব্বোধ্য অপরাধে অপরাধী হইয়া রহিল, এবং তাহারই ক্ষুব্ধ বেদনা কূলপ্লাবিনী উচ্ছ্বসিতা তটিনীর ন্যায় একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নির্ম্মাণ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অনেক রাত্রে অমরনাথ ধীরে ধীরে ডাকিয়া কহিল, অপর্ণা, তোমার এখানে থাকতে কি ভাল লাগে না? অপর্ণা জাগিয়াছিল, বলিল, না।

বাপের বাড়ী যাবে ?

যাব !

কাল যেতে চাও ?

চাই। ক্ষুব্ধ অমরনাথ জবাব শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আর যদি যাওয়া না হয় ? অপর্ণা কহিল, তা হলে যেমন আছি তেমনি থাকব। আবার কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া থাকিল; অমরনাথ ডাকিল, অপর্ণা! অপর্ণা অন্যমনস্কভাবে বলিল, কি !

আমাকে কি তোমার কোন প্রয়োজন নাই ?

অপর্ণা গায়ের কাপড় চোপড় সর্ব্বাঙ্গে বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে শুইয়া বলিল, ও-সব কথায় বড় ঝগড়া হয়, ও-সব ব'লো না !

ঝগড়া হয়—কি করে জানলে ?

জানি, আমাদের বাপের বাড়ীতে মেজদা ও মেজবৌ এই নিয়ে নিত্য কলহ করে। আমার ঝগড়া কলহ ভাল লাগে না। শুনিয়া অমরনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে যেন এই কথাটাই এতদিন খুঁজিতেছিল, হঠাৎ আজ যেন তাহা হাতে ঠেকিল, বলিয়া উঠিল, এস অপর্ণা আমরাও ঝগড়া করি ? এমন করে থাকার চেয়ে ঝগড়া কলহ ঢের ভাল। অপর্ণা স্থিরভাবে কহিল, ছি, ঝগড়া কেন করতে যাবে ? তুমি ঘুমোও !

তাহার পর অপর্ণা ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও অমরনাথ বুঝিতে পারিল না।

প্রত্যূষে উঠিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন অপর্ণার কাজ-কর্ম্মে ও জপ-তপে কাটিয়া যায়। এতটুকু রঙ্গরস বা কৌতুকের মধ্যে সে প্রবেশ করে না, দেখিয়া তাহার সমবয়সীরা বিদ্রূপ করিয়া কত কি বলে, ননদেরা 'গোঁসাই

ঠাকুর' বলিয়া পরিহাস করে, তথাপি সে দলে মিশিতে পারিল না; কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল, দিনগুলা মিছা কাটিয়া যাইতেছে। আর এই যে অলক্ষ্য আকর্ষণে তাহার প্রতি শোণিতবিন্দু, সেই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মন্দির অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার জন্ম পূর্ণিমার উদ্বেলিত সিন্ধুবারির মত হৃদয়ের কূলে উপকূলে অহরহঃ আছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সংযম কিসে হইবে? ঘর-কন্নার কাজে, না ছোট-খাট হাস্য-পরিহাসে? ক্ষুব্ধ অসুস্থ চিত্ত তাহার এই যে বিপুলভ্রান্তি মাথায় করিয়া আপনা-আপনি পাক খাইয়া মরিতেছে, তাহার নিকট স্বামীর আদর ও স্নেহ, পরিজনবর্গের প্রীতি-সম্ভাষণ ঘেঁসিবে কি করিয়া? কি করিয়া সে বুঝিবে, কুমারীর দেবসেবা দ্বারা নারীত্বের কর্ত্তব্যের সবটুকু পরিসর পরিপূর্ণ করা যায় না।

৭

অমরনাথের বুঝিবার ভুল—সে উপহার লইয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়াছে। বেলা তখন নটা দশটা। স্নানান্তে অপর্ণা পূজা করিতে যাইতেছিল। গলার স্বর যতটা সম্ভব মধুর করিয়া অমর কহিল, অপর্ণা, তোমার জন্ম কিছু উপহার এনেছি, দয়া করে নেবে কি? অপর্ণা হাসিয়া বলিল, নেব বৈকি! অমরনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আনন্দে সৌখীন রুমালে বাঁধা একটা বাক্সর ডালা খুলিতে বসিল। ডালার উপরে অপর্ণার নাম সোণার জলে লেখা। এখন একবার সে অপর্ণার মুখখানি দেখিবার জন্ম তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিল মানুষ কাচের নকল চোখ পরিয়া যেমন করিয়া চাহে, তেমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পানে চাহিয়া আছে। দেখিয়া তাহার সমস্ত উৎসাহ একনিমিষে নিবিয়া গিয়া যেন অর্থহীন একফোঁটা শুষ্ক হাসির মাঝে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিতে

চাহিল। লজ্জায় মরিয়া গিয়াও সে বাক্সের ডালা খুলিয়া গোটা-কতক কুন্তলিনের শিশি, আরো কি-কি বাহির করিতে উদ্যত হইল, অপর্ণা বাধা দিয়া কহিল, এনেছ কি আমার জন্য? অমরনাথের হইয়া আর কে যেন জবাব দিল, হাঁ, তোমার জন্যই এনেছি। দেলখোসগুলো—

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, বাক্সটাও কি আমাকে দিলে?

নিশ্চয়ই।

তবে আর কেন মিছে ওসব বের করবে, বাক্সতেই থাক্। তা থাক্। তুমি ব্যবহার করবে ত? অকস্মাৎ অপর্ণা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। সমস্ত দুনিয়ার সহিত লড়াই করিয়া তাহার ক্ষত বিক্ষত হৃদয় পরাস্ত হইয়া বৈরাগ্য গ্রহণ পূর্ব্বক নিভৃতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সহসা তাহার গায়ে এই স্নেহের অনুরোধ কুৎসিত বিদ্রূপের আঘাত করিল; চঞ্চল হইয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রতিঘাত করিল; বলিল, নষ্ট হবে না, রেখে দাও। আমি ছাড়াও আরও অনেকে ব্যবহার করতে জানে। এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া অপর্ণা পূজার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। আর অমরনাথ,—বিহ্বলের মত সেই প্রত্যাখ্যাত উপহারের উপর হস্ত রাখিয়া সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। প্রথমে সে সহস্রবার মনে মনে আপনাকে নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিল। বহুক্ষণ পরে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অপর্ণা পাষাণী। তাহার চোখ জলে ভাসিয়া আসিল—সেইখানে বসিয়া একভাবে ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল। অপর্ণা তাহাকে যদি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিত, তাহা হইলে কথাটা অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারিত। সে যে প্রত্যাখ্যান না করিয়াও প্রত্যাখ্যানের সবটুকু জ্বালা তাহার গায়ে মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহার প্রতিকার সে কি করিয়া করিবে? অপর্ণাকে তাহার পূজার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহারই সম্মুখে তাহার উপেক্ষিত উপহারটা নিজেই লাথি মারিয়া ভাঙিয়া

ফেলিবে, এবং সর্ব্বসমক্ষে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিবে যে সে তাহার মুখ আর দেখিবে না ? সে কি করিবে, কত কি বলিবে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইবে ; হয় ত ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসী হইবে, হয় ত অপর্ণার কোন দারুণ দুর্দ্দিনের দিনে অকস্মাৎ কোথাও হইতে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। এমনি সম্ভব ও অসম্ভব কত রকম উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাদ-প্রতিবাদ তাহার অপমান-পীড়িত মস্তিষ্কের ভিতর অধীরতার সৃষ্টি করিতে লাগিল। ফলে কিন্তু সে তেমনি বসিয়া রহিল, এবং তেমনি কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার এই আগাগোড়া বিশৃঙ্খল সঙ্কল্পের সুদীর্ঘ তালিকা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল না।

৮

তাহার পর দুই দিন দুই রাত্রি গত হইয়াছে, অমরনাথ ঘরে শুইতে আসে নাই। মা জানিতে পারিয়া বধূকে ডাকিয়া ঈষৎ ভর্ৎসনা করিলেন, পুত্রকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলেন ; দিদিশাশুড়ী এই সূত্রে একটু রঙ্গ করিয়া লইলেন। এমনি সাতে পাঁচে ব্যাপারটা লঘু হইয়া গেল। রাত্রে অপর্ণা স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল, বলিল, যদি মনে কষ্ট দিয়ে থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর। অমরনাথ কথা কহিতে পারিল না। শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া, বিছানার চাদর বার বার টানিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। সম্মুখেই অপর্ণা দাঁড়াইয়া, মুখে তাহার ম্লান হাসি ; সে আবার কহিল, ক্ষমা করবে না ? অমরনাথ মুখ নিচু করিয়াই বলিল, ক্ষমা কিসের জন্য ? ক্ষমা করবার অধিকারই বা আমার কি ?, অপর্ণা স্বামীর দুই হাত আপনার হাতের ভিতর লইয়া বলিল, ও কথা ব'লো না। তুমি স্বামী, তুমি রাগ করে থাকলে কি আমার চলে ?

তুমি ক্ষমা না করলে আমি দাঁড়াব কোথায়? কেন রাগ করেছ, বল। অমরনাথ আর্দ্র হইয়া কহিল, রাগ ত করি নাই।

কর নাই ত?

না। অপর্ণা কলহ ভালবাসিত না; বিশ্বাস না করিয়াও বিশ্বাস করিল। কহিল, তাই ভাল। তাহার পর নিতান্ত নির্ভাবনায় বিছানার একপ্রান্তে শুইয়া পড়িল।

অমরনাথ কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অন্যদিক মুখ ফিরাইয়া কেবলই সে মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল যে, এ কথা তাহার স্ত্রী বিশ্বাস করিল কি করিয়া! সে যে দুদিন আসে নাই, দেখা করে নাই, তথাপি সে রাগ করে নাই—এটা কি বিশ্বাস করিবার কথা? এত কাণ্ড এত শীঘ্র মিটিয়া সব বৃথা হইয়া গেল? তাহার পর যখন সে বুঝিতে পারিল অপর্ণা সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে একেবারে উঠিয়া বসিল; এবং দ্বিধাশূন্য হইয়া জোর করিয়া ডাকিয়া ফেলিল, অপর্ণা, তুমি বুঝি ঘুমুচ্ছো? ও অপর্ণা!

অপর্ণা জাগিয়া উঠিল, বলিল, ডাকছ?

হাঁ—কাল আমি কলকাতায় যাব।

কৈ, সে কথা ত আগে শুনি নাই! এত শীঘ্র তোমার কলেজের ছুটি ফুরোল? আরো দুদিন থাকতে পার না?

না, আর থাকা হয় না। অপর্ণা একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার উপর রাগ করে যাচ্ছ? ইহা যে সত্য কথা অমরনাথ তাহা জানিত, কিন্তু সে কথা সে স্বীকার করিতে পারিল না। সঙ্কোচ আসিয়া তাহার যেন কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানিয়া ফিরাইল। আশঙ্কা হইল পাছে সে আপনার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিয়া অপর্ণার সম্ভ্রম হানি করিয়া বসে; এমনি করিয়া এই কৌতূহল-বিমুখ নারীর

নিশ্চেষ্টতা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্বামীত্বের যেটুকু তেজ সে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, সে সবটুকু এই চার-পাঁচ মাস ধরিয়া দিনে দিনে অপর্ণা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, এখন সে ক্রোধ প্রকাশ করিবে কোন্ সাহসে? অপর্ণা আবার বলিল, রাগ করে কোথাও যেয়ো না। তা হলে আমার মনে বড় ব্যথা লাগবে। অমরনাথ মিথ্যা ও সত্যে যাহা বানাইয়া বলিতে পারিল—তাহার অর্থ এই যে, সে রাগ করে নাই এবং তাহারই প্রমাণ স্বরূপ সে আরো দুইদিন থাকিয়া যাইবে। থাকিলও তাই। কিন্তু কাঁদিয়া জয়ী হইবার একটা লজ্জাজনক অস্বস্তি লইয়া বাড়ীতে থাকিল।

৯

ঝাড়া বৃষ্টির একটা সুবিধা আছে—তাহাতে আকাশ নির্ম্মল হয়। কিন্তু টিপি টিপি বৃষ্টিতে মেঘ কাটে না, শুধু পায়ের নীচে কাদা ও চতুর্দ্দিকে নিরানন্দময় ভাব বাড়িয়া উঠে। বাড়ী হইতে যে কাদা মাখিয়া অমরনাথ কলিকাতায় আসিল, তাহা ধুইয়া ফেলিবার একটুখানি জলও সে এই বৃহৎ নগরীর ভিতর খুঁজিয়া পাইল না। এখানে তাহার পূর্ব্বপরিচিত যে সব সুখ ছিল, তাহাদের কাছে এই পঙ্কিল পা দুখানি বাহির করিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। না লাগে লেখাপড়ায় মন, না আমোদ আহ্লাদে তৃপ্তি। এখানেও থাকিতে ইচ্ছা করে না, বাড়ী যাইতেও প্রবৃত্তি নাই। সমস্ত বুকের উপর তাহার যেন দুর্ব্বহ যন্ত্রণাভার চাপানো রহিয়াছে, এবং তাহা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল বক্ষপঞ্জর পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে, কিন্তু বিফল চেষ্টা।

এমনি অন্তর্বেদনা লইয়া সে একদিন অসুখে পড়িল। সংবাদ পাইয়া

পিতামাতা ছুটিয়া আসিলেন কিন্তু অপর্ণাকে সঙ্গে আনিলেন না! অমরনাথও যে ঠিক এমনটি আশা করিয়াছিল তাহা নয়, তবু দমিয়া গেল। অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এ সময়ে স্বভাবতঃই তাহার অপর্ণাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না, পিতামাতাও তাহা বুঝিলেন না। কেবল ঔষধ পথ্য আর ডাক্তার বৈদ্য! অবশেষে সে তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল—অমরনাথ একদিন প্রাণত্যাগ করিল।

বিধবা হইয়া অপর্ণা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা তাহার মনে হইল, এ বুঝি তাহারই কামনার ফল! ইহাই বুঝি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। বাহিরে শুনিতে পাইল যে তাহার পিতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। এ কি সব স্বপ্ন? তিনি আসিলেন কখন? অপর্ণা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সত্য সত্যই রাজনারায়ণবাবু বালকের মত ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতেছেন। পিতার দেখাদেখি সেও এবার ঘরের ভিতর লুটিয়া পড়িল; অশ্রু-প্রবাহ মাটী ভিজাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই; পিতা আসিয়া অপর্ণাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন, মা! অপর্ণা!

অপর্ণা কাঁদিয়া বলিল, বাবা!

তোর মদনমোহন যে তোকে মন্দিরে ডেকেছে মা!

চল বাবা, যাই।

তোর যে সেখানে সব কাজ প'ড়ে আছে মা!

চল বাবা বাড়ী যাই।

চল মা, চল। পিতা স্নেহে মস্তক চুম্বন করিলেন, বুক দিয়া সর্ব্ব দুঃখ মুছিয়া লইলেন, এবং তাহার পর কন্যার হাত ধরিয়া পরদিন বাটী আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, ওই মা তোমার মন্দির। ওই তোমার মদনমোহন! নিরাভরণা অপর্ণার বৈধব্য বেশে তাহাকে আর এক রকম দেখিতে হইল। যেন এই সাদা বস্ত্র ও রুক্ষ কেশে তাহাকে অধিক মানাইল। সে তাহার পিতার কথা ভারি বিশ্বাস করিল, ভাবিল, দেবতার আহ্বানেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ঠাকুরের মুখে যেন তাই হাসি, মন্দিরে যেন তাই শতগুণ সৌরভ। নিজে যেন সে এ পৃথিবীর অনেক উচ্চে এইরূপ মনে হইল।

যে স্বামী নিজের মরণ দিয়া তাহাকে পৃথিবীর এত উচ্চে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত স্বামীর উদ্দেশে শতবার প্রণাম করিয়া অপর্ণা তাহার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিল।

১০

শক্তিনাথ একমনে ঠাকুর গড়িতেছিল। পূজা করার চেয়ে, ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন্ রং বেশি মানাইবে, এই তাহার আলোচ্য বিষয়। কি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে জপ করিতে হয়, এসব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না। দেবতার সম্পর্কে সে আপনাকে আপনি প্রমোশন দিয়া, সেবকের স্থান হইতে পিতার স্থানে উঠিয়া আসিয়াছিল। তবু তাহার পিতা তাহাকে আদেশ করিলেন, শক্তিনাথ, আজ আমার জ্বর বেড়েছে, জমিদার বাটিতে গিয়ে তুমি পূজা করে এস। শক্তিনাথ বলিল, এখন ঠাকুর গড়ছি। বৃদ্ধ অসমর্থ পিতা রাগ করিয়া বলিলেন, ছেলে-খেলা এখন থাক্ বাবা, কাজ সেরে এস। পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে তাহার মোটে ইচ্ছা হইল না—তবু উঠিতে হইল। পিতার

আদেশে স্নান করিয়া, চাদর ও গামছা কাঁধে ফেলিয়া দেবমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার পূর্ব্বেও সে কয়েকবার এ মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছে কিন্তু এমন কাণ্ড কখন দেখে নাই। এত পুষ্প-গন্ধ, এত ধূপ-ধূনার আড়ম্বর, ভোজ্য ও নৈবিদ্যের এত বাহুল্য। তার ভারি ভাবনা হইল এত লইয়া সে কি করিবে? কিরূপে কাহার পূজা করিবে? সকলের চেয়ে সে অপর্ণাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, এত দিন কোথায় ছিল। অপর্ণা কহিল, তুমি কি ভট্টাচার্য্যমশায়ের ছেলে? শক্তিনাথ বলিল, হাঁ। —তবে পা ধুয়ে পূজা করতে ব'স। পূজা করিতে বসিয়া শক্তিনাথ আগাগোড়া ভুলিয়া গেল। একটা মন্ত্রও তাহার মনে পড়ে না। সেদিকে তাহার মনও নাই, বিশ্বাসও নাই—শুধু ভাবিতে লাগিল, এ কে, কেন এত রূপ, কি জন্য বসিয়া আছে ইত্যাদি। পূজার পদ্ধতি ওলট পালট হইতে লাগিল। কখনো ঘণ্টা বাজাইয়া, কখনো ফুল ফেলিয়া, কখনো নৈবিদ্যের উপর জল ছিটাইয়া এই অজ্ঞ নূতন পুরোহিতটী যে পূজার কেবল ভান করিতেছে মাত্র, বিজ্ঞ পরীক্ষকের মত পিছনে বসিয়া অপর্ণা সব বুঝিল। চিরদিন দেখিয়া দেখিয়া এ সব ভাল করিয়াই জানে, শক্তিনাথ তাহাকে ফাঁকি দিবে কি করিয়া? পূজাবসানে, কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল, তুমি বামুনের ছেলে, অথচ পূজা করতে জান না! শক্তিনাথ বলিল, জানি। —ছাই জান! শক্তিনাথ বিহ্বলের মত একবার তাহার মুখপানে চাহিল, তাহার পর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অপর্ণা ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল, ঠাকুর, এ সব বেঁধে নিয়ে যাও—কিন্তু কাল আর এসো না। তোমার বাবা আরোগ্য হলে তিনি আসবেন। অপর্ণা নিজেই তাহার চাদর ও গামছায় সমস্ত বাঁধিয়া তাহাকে বিদায় করিল। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া শক্তিনাথ বার বার শিহরিয়া উঠিল।

এদিকে অপর্ণা নূতন করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা শেষ করিল।

১১

একমাস গত হইয়াছে। আচার্য্য যদুনাথ, জমিদার রাজনারায়ণবাবুকে বুঝাইয়া বলিতেছেন, আপনি ত সমস্তই জানেন; বড় মন্দিরে এই বৃহৎ পূজা ভট্টাচার্য্যের ছেলের দ্বারা কিছুতেই সম্পন্ন হতে পারে না। রাজনারায়ণবাবু সায় দিয়া বলিলেন, অনেক দিন হ'ল অপর্ণাও ঠিক এই কথাই বলেছিল। আচার্য্য মুখমণ্ডল আরো গম্ভীর করিয়া কহিলেন, তা ত হবেই। তিনি হলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা! তাঁর কি কিছু অগোচর আছে। জমিদারবাবুরও ঠিক এই বিশ্বাস। আচার্য্য কহিতে লাগিলেন, পূজা আমিই করি আর যেই করুন ভাল লোক চাই! মধু ভট্টাচার্য্য যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনিই পূজা করেছেন, এখন তাঁর পুত্রেরই পৌরোহিত্য করা উচিত, কিন্তু সেটা ত মানুষ নয়! কেবল পট আঁকতে পারে, পুতুল গড়তে জানে, পূজা অর্চ্চনার কিছুই জানে না। রাজনারায়ণবাবু অনুমতি দিলেন, পূজা আপনি করবেন, তবে অপর্ণাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখব। পিতার নিকট এ কথা শুনিয়া অপর্ণা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাও কি হয়? বামুনের ছেলে নিরাশ্রয়, কোথায় তাকে বিদায় করব? যেমন জানে তেমনই পূজা করবে। ঠাকুর তাতেই সন্তুষ্ট হবেন। কন্যার কথায় পিতার চৈতন্য হইল—এতটা আমি ভেবে দেখি নাই। মা, তোমার মন্দির, তোমার পূজা, তোমার যা ইচ্ছা তাই ক'রো, যাকে ইচ্ছা ভার দিয়ো। এই কথা বলিয়া পিতা প্রস্থান করিলেন। অপর্ণা শক্তিনাথকে ডাকিয়া আনিয়া পূজার ভার দিল। বকুনি খাইয়া অবধি সে আর এ দিকে আসে নাই, মধ্যে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সে

নিজেও রুগ্ন। শুষ্ক মুখে তাহার শোক-দুঃখের চিহ্ন দেখিয়া অপর্ণার মায়া হইল, কহিল, তুমি পূজো ক'রো; যা জান তাই ক'রো তাতেই ঠাকুর তৃপ্ত হবেন। এমন স্নেহের স্বর শুনিয়া তাহার সাহস হইল, সাবধান হইয়া মন দিয়া পূজা করিতে বসিল। পূজা শেষ হইলে অপর্ণা নিজের হাতে সে যাহা খাইতে পারে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, বেশ পূজা করেছ। বামুনঠাকুর, তুমি কি হাতে রেঁধে খাও?

কোন দিন রাঁধি, কোন দিন—যে দিন জ্বর হয়, সে দিন আর রাঁধতে পারি না।

তোমার কি কেউ নাই?

না। শক্তিনাথ চলিয়া গেলে, অপর্ণা তাহার উদ্দেশে বলিল, আহা! দেবতার কাছে যুক্ত করে তাহার হইয়া প্রার্থনা করিল, ঠাকুর ইহার পূজায় তুমি সন্তুষ্ট হইয়ো, ছেলেমানুষের দোষ অপরাধ লইও না। সেই দিন হইতে প্রতিদিন অপর্ণা দাসী দ্বারা সংবাদ লইত, সে কি খায়, কি করে, কি তাহার প্রয়োজন। নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ কুমারটীকে সে তাহার অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিয়া তাহার সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইল। এবং সেই দিন হইতে এই কিশোর ও কিশোরী, তাহাদের ভক্তি-স্নেহ ভুল-ভ্রান্তি সব এক করিয়া এই মন্দিরটীকে আশ্রয় পূর্ব্বক জীবনের বাকি কাজগুলিকে পর করিয়া দিল। শক্তিনাথ পূজা করে, অপর্ণা দেখাইয়া দেয়। শক্তিনাথ স্তব পাঠ করে, অপর্ণা মনে মনে তাহার সহজ অর্থ দেবতাকে বুঝাইয়া দেয়। শক্তিনাথ গন্ধ-পুষ্প হাতে দিয়া তুলিয়া লয়, অপর্ণা অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলে, বামুনঠাকুর, আজ এমনি করে সিংহাসন সাজাও দেখি, বেশ দেখাবে। এমনি করিয়া এই বৃহৎ মন্দিরের বৃহৎ কাজ চলিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আচার্য্য কহিলেন, ছেলে-খেলা হচ্ছে। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বলিলেন, যা করে হোক মেয়েটা নিজের অবস্থা ভুলে থাকলেই বাঁচি।

থিয়েটারের ষ্টেজে যেমন পাহাড় পর্ব্বত, ঝড় জল এক নিমিষে উড়িয়া গিয়া একটা মস্ত রাজপ্রাসাদ কোথা হইতে আসিয়া জোটে, আর লোক-জনের, সুখ-সম্পদের মাঝে, দুঃখ-দৈন্যের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়, শক্তি-নাথের জীবনেও যেন সেইরূপ হইয়াছে। সে জাগিয়াছিল, এখন ঘুমাইয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, কিংবা নিদ্রায় দুঃখস্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রথমে তাহার ভাল ঠাহর হইত না। তথাপি এই দায়িত্বহীন দেব-সেবার সুবর্ণ-শৃঙ্খল যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়াছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে, ঐ বিক্ষিপ্ত পুতুলগুলা মাঝে মাঝে সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইত, সে মৃত পিতার কথা মনে করিত, নির্জ্জের পূর্ব্ব স্বাধীনতার কথা ভাবিত; মনে হইত সে যেন বিকাইয়া গিয়াছে, অপর্ণা তাহাকে কিনিয়াছে; অমনি অপর্ণার স্নেহ ক্রমে মোহের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ একদিন শক্তিনাথের মামাত ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার ভগিনীর বিবাহ। মামা কলিকাতায় থাকেন, সময় ভাল, কাজেই সুখের দিনে ভাগিনেয়কে মনে পড়িয়াছে। যাইতেই হইবে। কলিকাতা যাইবে—কথাটা শক্তিনাথের খুব ভাল লাগিল। সমস্ত রাত্রি সে দাদার নিকট বসিয়া কলিকাতার সুখের গল্প, শোভার কাহিনী, সমৃদ্ধির বিবরণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। পরদিন মন্দিরে যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অপর্ণা ডাকিয়া পাঠাইল; শক্তিনাথ গিয়া বলিল, আজ আমি কলকাতায় যাব—মামা ডেকে পাঠিয়েছেন—বলিয়াই সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, কবে ফিরে আসবে? শক্তিনাথ ভয়ে ভয়ে বলিল,

মামা আসতে বললেই চলে আসব। অপর্ণা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আবার সেই বৃদ্ধ আচার্য্য আসিয়া পূজা করিতে বসিল। আবার তেমনি করিয়া অপর্ণা পূজা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা বলিবার আর তাহার প্রয়োজন হইল না, ইচ্ছাও ছিল না!

কলিকাতায় আসিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যে শক্তিনাথের বেশ দিন কাটিলেও কয়েক দিন পরেই বাড়ীর জন্য তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ অলস দিনগুলো আর যেন কাটিতে চাহে না! রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, অপর্ণা যেন তাহাকে ক্রমাগত ডাকিতেছে, আর উত্তর না পাইয়া রাগ করিতেছে। একদিন সে মামাকে কহিল, আমি বাড়ী যাব। মামা নিষেধ করিলেন—সে জঙ্গলে গিয়ে আর কি হবে? এইখানে থেকে লেখাপড়া কর, আমি তোমার চাকরি করে দেবো। শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। মামা কহিলেন, তবে যাও। বড়বৌ শক্তিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, কাল বুঝি বাড়ী যাবে? শক্তিনাথ বলিল, হ্যাঁ যাব! —অপর্ণার জন্য মন কেমন করছে না কি? শক্তিনাথ বলিল, হাঁ। —সে তোমাকে খুব যত্ন করে, নয়? শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল, খুব যত্ন করে। বড়বৌ মুখ টিপিয়া হাসিলেন; তিনি অপর্ণার কথা পূর্ব্বেই শক্তিনাথের নিকট শুনিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, তবে ঠাকুরপো, এই দুটি জিনিস নিয়ে যাও। তাকে দিয়ো, সে আরো ভালো বাসবে। বলিয়া তিনি একটা শিশির ছিপি খুলিয়া খানিকটা দেলখোস শক্তিনাথের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। গন্ধে শক্তিনাথ পুলকিত হইয়া শিশি দুইটি চাদরে বাঁধিয়া লইয়া পরদিন বাটী ফিরিয়া আসিল।

শক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, পূজা শেষ হইয়াছে। চাদরে সেই শিশি দুইটি বাঁধা আছে—কিন্তু দিতে সাহস হইতেছে না; এই কয়দিনে অপর্ণা তাহার নিকট হইতে এতই দূরে সরিয়া গিয়াছে। মুখ ফুটিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না—তোমার জন্য সাধ করিয়া কলিকাতা হইতে ইহা আনিয়াছি। সুগন্ধে তোমার দেবতা তৃপ্ত হন, তাই তুমিও হইবে। এইভাবে সাত-আট দিন কাটিল; নিত্য সে চাদরে বাঁধিয়া শিশি দুইটি লইয়া আসে, নিত্য ফিরাইয়া লইয়া যায়, আবার যত্ন করিয়া পরদিনের জন্য তুলিয়া রাখে। পূর্ব্বের মত একদিনও যদি অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে হয় ত সে তাহাকে তাহা দিয়া ফেলিত, কিন্তু এ সুযোগ আর কিছুতেই হইল না। আজ দুই দিন হইতে তাহার জ্বর হইতেছে, তবু ভয়ে ভয়ে সে মন্দিরে পূজা করিতে আসে। কি একটা অজানা আশঙ্কায় সে পীড়ার কথাও বলিতে পারে না। অপর্ণা কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিত যে দুইদিন হইতে শক্তিনাথ কিছুই খায় নাই, অথচ পূজা করিতে আসিতেছে! অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, তুমি দুদিন হতে কিছু খাও নাই কেন? শক্তিনাথ শুষ্কমুখে কহিল, আমার রাত্রে রোজ জ্বর হয়।

জ্বর হয়? তবে স্নান করে পূজা করতে এস কেন? এ কথা বল নাই কেন? শক্তিনাথের চোখে জল আসিল। মুহূর্ত্তে সব কথা ভুলিয়া গিয়া সে চাদর খুলিয়া শিশি দুইটি বাহির করিয়া বলিল, তোমার জন্য এনেছি।

আমার জন্য?

হাঁ, তুমি গন্ধ ভালবাস না? উষ্ণ দুধ যেমন একটুখানি আগুনের তাপ পাইবামাত্র টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠে, অপর্ণার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল—শিশি দুইটি দেখিয়াই সে চিনিয়াছিল; গভীর স্বরে বলিল, দাও। হাতে লইয়া অপর্ণা মন্দিরের বাহিরে যেখানে

পূজা করা ফুল শুকাইয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে শিশি দুইটি নিক্ষেপ করিল! আতঙ্কে শক্তিনাথের বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল, বামুনঠাকুর, তোমার মনে এত! আর তুমি আমার সাম্‌নে এসো না, মন্দিরের ছায়াও মাড়িয়ো না। অপর্ণা চম্পকাঙ্গুলি দিয়া বহির্দ্দেশ দেখাইয়া বলিল, যাও—

আজ তিন দিন হইল শক্তিনাথ গিয়াছে। আবার যদু আচার্য্য পূজা করিতে বসিয়াছেন, আবার ম্লান মুখে অপর্ণা চাহিয়া দেখিতেছে, এ যেন কাহার পূজা কে আসিয়া শেষ করিতেছে! পূজা সাঙ্গ করিয়া নৈবেদ্যের রাশি গামছায় বাঁধিতে বাঁধিতে আচার্য্য মশায় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল! আচার্য্যের মুখপানে চাহিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, কে মারা গেল?

তুমি বুঝি শোন নাই? কয়দিনের জ্বরে শক্তিনাথ ঐ মধু ভট্টাচার্য্যের ছেলে, আজ সকাল-বেলা মারা পড়েছে। অপর্ণা তবুও তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আচার্য্য দ্বারের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, পাপের ফলে আজকাল মৃত্যু হচ্ছে—দেবতার সঙ্গে কি তামাসা চলে মা! আচার্য্য চলিয়া গেলেন। অপর্ণা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাটিতে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে লাগিল; সহস্রবার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঠাকুর, এ কার পাপে?

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল; চোখ মুছিয়া সে সেই শুষ্ক ফুলের ভিতর হইতে স্নেহের দান মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। মন্দিরের ভিতর আবার প্রবেশ করিয়া দেবতার পায়ের কাছে তাহা নামাইয়া দিয়া কাঁদিয়া কহিল, ঠাকুর, আমি যা নিতে পারি নাই—তা তুমি নাও। নিজের হাতে আমি কখন তোমার পূজা করি নাই, করছি—তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।

বোঝা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

সাগরপুরে আজ মহাধূম, রসুনচৌকি আর ঢাকের বাদ্যে গ্রাম সরগরম। সপ্তাহ ধরিয়া যে কি কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, তাহা গ্রামের এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী চারি-পাঁচ ক্রোশের সকল লোক জানে! এ রাজসূয় যজ্ঞে ঢাক-ঢোলের এমন মহান একত্র সমাবেশ, সানাই-দলের এমন আদর্শ ঐক্যভাব, কাংস্য-নির্ম্মিত বাদ্য-যন্ত্রের এমন প্রচণ্ড বিক্রম দেখা গিয়াছিল যে গ্রামের লোক ইতিপূর্ব্বে এমন কাণ্ড কখনও আর দেখে নাই। বং-বেরং বাদ্য-যন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যশ্রেণীর যে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রামের পশুগুলা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে বিশেষ গরু-বাছুরের দল, ঢাক-ঢোলের আত্মদ্রোহিতায় তাহাদের মর্ম্মপীড়ার আর সীমা নাই! এত সমারোহের কারণ, একটা নাবালক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের বিবাহ! সাগরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হরদেব মিত্রের একমাত্র পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়াই এমন কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। হরদেব মিত্র বেশ বড়লোক, প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ হাজার টাকা তাঁহার বাৎসরিক আয়। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার মিত্র, হেয়ার সাহেবের স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাশে সে পড়ে। অত অল্প বয়সে বিবাহের কারণ, একমাত্র সত্যেন্দ্রর মাতার বধূ-মুখ দেখিবার একান্ত সাধ!

বর্দ্ধমান জেলার দিল্‌জানপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলার সহিত সত্যেন্দ্রর বিবাহ হইয়া গেল।

রাঙা বৌ! সত্যেন্দ্র মহাসুখী!

দশ বছরের টুক্‌টুকে ছোট বৌটীর মুখ দেখিয়া সত্যেন্দ্রর জননী বিশেষ হৃষ্টচিত্ত হইলেন। বিবাহের পর বৎসরেই হরদেববাবু বধূ আনিলেন, কারণ গৃহিণীর এরূপ অভিসন্ধি ছিল না যে বধূকে পিতৃগৃহে রাখিয়া দেন। তিনি প্রায় বলিতেন, বিবাহ হইলে মেয়েকে আর বাপের বাটীতে রাখিতে নাই, মতটা মন্দ নহে!

সত্যেন্দ্রর পাঠের সুবিধার জন্য হরদেববাবুকে সস্ত্রীক কলিকাতাতেই থাকিতে হইত, সরলা কলিকাতায় আসিল। অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া সরলা হরদেববাবুর সহিত কথা কহিত এমন কি সত্যেন্দ্র উপস্থিত থাকিলেও সে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সহিত কথা বলিত, গৃহিণীর তাহাতে সুখ ভিন্ন অসুখ ছিল না।

কিছুদিন পরে কামাখ্যাবাবু সরলাকে একবার বাটী লইয়া গেলেন, তাহার দুই-এক মাস পরে সত্যেন্দ্র একদিন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, বইগুলোতে ছাতা ধরেছে, দোয়াতের কালি শুকিয়ে গেছে, এমন একজন নেই যে, এগুলো দেখে!

কথাটা মা বুঝিলেন, হরদেববাবুরও কানে গেল; তিনি হাসিয়া বৌ আনিতে পাঠাইলেন; লিখিলেন, আমার বাটীতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, মা ভিন্ন বোধ হয় থামিবে না! সুতরাং মাকে পাঠাইয়া দিবেন।

আবার সরলা আসিল। সত্যর ছোট-খাট কাজগুলি সে-ই করিত। বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখা, কলেজের কাপড় জামাগুলি ঠিক করিয়া রাখা অর্থাৎ তাড়াতাড়িতে দুই হাতে দুই রকমের বোতাম, কিম্বা আহার করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, কলেজের একঘণ্টা যায় যায় সময়ে,একপায় কার্পেটের অপর পায় বার্ণিস-করা জুতা সে না পরিয়া ফেলে,

ফর্সা জামার উপর রজক-ভবনে শুভাগমনের জন্ত প্রস্তুত চাদরের জুলুম না হয়, এইসব কাজগুলা সরলাই দেখিত, সরলা না থাকিলে এ সব গণ্ডগোল তাহার প্রায় ঘটিত। এমন অন্তমনস্ক লোক কেহ কখনও দেখে নাই! এ সকল কাজ সরলা ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা হইতও না বটে, আর হইলেও সত্যেন্দ্রর পছন্দ হইত না বলিয়াও বটে, কাজগুলি সরলাই করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুশীলার ছেলের অন্নপ্রাশন

সুশীলা সরলার বড়দিদি। তাহার ছেলের ভাত। সুতরাং কামাখ্যাবাবু দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সরলাকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন।

সরলার দিদি, সরলা ও সত্যেন্দ্রকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছে। বিশেষ, সরলা প্রায় তিন বৎসর যাবৎ দিল্‌জানপুরে যায় নাই। সত্যেন্দ্রও যখন যাইতে সম্মত হইল, তখন কামাখ্যাবাবু পরমানন্দে জামাতা কন্যা লইয়া দেশে আসিলেন।

গৃহিণী বহুদিবসের পর তাঁহাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন। যাহার ছেলের ভাত, সে আসিয়া দুই জনকেই অনেক কথা শুনাইয়া দিল, অনেক রকমে আপ্যায়িত করিল।

শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া যাইবার পর সত্যেন্দ্র বাটী যাইতে চাহিল, কিন্তু গৃহিণী তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন, বলিলেন, এতদিন পরে এসেছ, আরও কিছুদিন থাক্‌তে হবে।

সরলাও ছাড়িল না, সুতরাং আরও দুই-চারি দিন থাকিতে সত্যেন্দ্র সম্মত হইল। দুই-চারি দিন কাটিয়া গেল, তবু সরলা ছাড়িতে চাহে না! কিন্তু না যাইলেও নহে, পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হয়; পরীক্ষারও অধিক বিলম্ব নাই। আসিবার সময় সরলা জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে আবার কবে নিয়ে যাবে?

সত্যেন্দ্র কহিল, যখন যাবে তখনই।

তা হ'লে আমাকে দশ-বার দিন পরেই নিয়ে যেও।

সত্যেন্দ্র অতিশয় আহ্লাদিত হইল। সে এতটা ভাবে নাই।

তখন অশ্রু-জলের মধ্যে সরলা স্বামীকে বিদায় দিয়া হাসিয়া বলিল, দেখো, আমার জন্য যেন ভেব না, আর রাত্রি পর্য্যন্ত পড়ে যেন অসুখ না হয়।

রাত্রি দশটার অধিক না পড়িবার জন্য সরলা বিশেষ করিয়া মাথার দিব্য দিয়া দিল। কি একটা উদাস-পারা প্রাণ লইয়া সত্যেন্দ্র সেইদিন কলিকাতায় পৌছিল।

সত্যেন্দ্র একখানা পুস্তক লইয়া বসিয়াছিল। পুস্তকের পৃষ্ঠার সহিত মনের একটা বিষম দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিয়াছিল।

সত্যেন্দ্র গণিয়া দেখিল, সমস্ত দিনে মোটে ছাব্বিশ লাইন পড়া হইয়াছে। দুঃখিত ভাবে সে ভাবিল, বাঃ! এই রকম পড়্‌লেই পাশ হব! ক্রমে দুঃখ ঈষৎ ক্রোধে পরিণত হইল। সে ভাবিল, সমস্ত পোড়ামুখী সরোর দোষ। এই পাঁচদিন এসেছি, একটুকুও পড়্‌তে পারি নি। আগে মনে হ'ত পড়ার সময় বিরক্ত করে, দশটার বেশি পড়্‌তে গেলেই আলো নিভিয়ে দেয়, একে কোথাও পাঠিয়ে দিলে ভাল ক'রে পড়্‌বো। ঠিক উল্টো! কালই তাকে আন্‌তে যাবো, না হ'লে লজ্জার খাতিরে কি ফেল্ হবো?

যাহা হোক, সত্যেন্দ্রনাথ এইরূপ একটা মতলব আঁটিতেছিল—কি করিয়া আনাই। কেমন করিয়াই বা বলি? লজ্জা করে। এত ভালই বা বাসিলাম কেমন করিয়া? দুদিন—

একটা ভৃত্য আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম হাতে দিল, সত্যেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইল, আর ভাবিবার সময় নাই; কোথাকার টেলিগ্রাম? খুলিতে খুলিতে সত্যর হৃৎকম্প হইল। ভিতরে যাহা লেখা ছিল, তাহাতে মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। সরলা পীড়িতা।

সেই দিনই হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে লইয়া দিলজানপুর যাত্রা করিলেন।

বাটির সম্মুখে কামাখ্যাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হরদেববাবু চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা কেমন?

কামাখ্যাবাবু কহিলেন, আসুন, ভিতরে চলুন।

হরদেববাবু ভিতরে গিয়া দেখিলেন, সরলা বিসূচিকা রোগে আক্রান্তা, একদিনে সরলাকে যেন আর চেনা যায় না! চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, পদ্মের মত মুখখানিতে কালিমা পড়িয়াছে। বিজ্ঞ হরদেববাবু বুঝিলেন অবস্থা বড় ভাল নহে। চক্ষু মুছিয়া ডাকিলেন, মা, সরলা!

সরলা চাহিয়া দেখিল। তখনও সরলার বেশ চৈতন্য আছে।—কেমন আছ মা?

সরলা হাসিয়া বলিল, ভাল আছি ত!

দুজনেই বুঝিল, এটা আপোষে মিটমাট হইয়া গেল। সকলে চলিয়া যাইলে, সত্যেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিল। দারুণ আতঙ্কে কথা বাহির হইল না। তখন জোর করিয়া নীরস ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় সত্যেন্দ্র ডাকিল, সরো! শুষ্ক ভাঙ্গা গলা? ক্ষতি কি? সেই চির-পরিচিত স্বর, সেই আদরের ডাক—সরো? একি ভুল হয়? সরলা চাহিল। সে হরদেববাবুকে দেখিয়া পূর্ব্বেই সত্যেন্দ্রর আগমন অনেকটা অনুমান করিয়াছিল। সরলা স্বামীকে তামাসা করিতে বড় ভালবাসিত, হাসিয়া বলিল, কি, নিতে এসেছ?

কথা বসিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ কোন মতে সত্যেন্দ্র চক্ষুর জল চাপা দিয়া রাখিয়াছিল, অবস্থা দেখিয়া সে বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

সত্যেন্দ্র জানিত, এ সময়ে কাঁদিতে নাই। কিন্তু পোড়া চোখের জলের কি সে বিবেচনা আছে? বেশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দে তাহারা

একটির পর একটি করিয়া ফোঁটায় নামিতে আরম্ভ করিল। তাহারা যে সরলার অশ্রুর সঙ্গে মিশিতেছে। এ অবকাশ তাহাদের কখনও হইয়াছে কি? কখনও হয় নাই। তোমার কিংবা সরলার খাতিরে তাঁহারা কি এ সুযোগ ছাড়িয়া দিবে? সরলা স্বামীকে কখনও কাঁদিতে দেখে নাই! সেও কাঁদিল। অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া সে বলিল, ছি, কাঁদ কেন? পুরুষমানুষের কি কাঁদতে আছে?

একি? বটে সরলা? বেশ বুঝিয়াছ। অন্তর্দাহে তাহারা শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাউক, এক ফোঁটা জল যেন না পড়ে। অশ্রু স্ত্রীলোকের জন্য। পুরুষের তাহাতে হাত দিবার অধিকার নাই! যন্ত্রণায় পুড়িয়া যাও কাঁদিতে পাইবে না। কাঁদিলে স্ত্রীলোক হইয়া যাইবে। সরলা! এ ব্যবস্থা কি তোমরাই করিয়াছ? সরলা স্বামীর হাত আপনার হাতে টিপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, পরজন্ম বিশ্বাস কর কি?

সত্যেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, করতাম কি না জানি না, কিন্তু আজ হ'তে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব।

সরলার মুখে ঈষৎ হাসির চিহ্ন প্রকাশ পাইল। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে দেখিয়া, কামাখ্যাবাবু, হরদেববাবু এবং ডাক্তারবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, আশা বড় কম, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরদিন বেলা সাতটার সময় সরলার মৃত্যু হইল।

সন্ধ্যার সময় হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবার বিবাহ

কি যেন কি একটা হইয়া গিয়াছে। রাজশয্যায় শয়ন করিয়া ইন্দ্রত্বের সুখ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছিলাম, টানিয়া কে যেন সুখের স্বপ্নটুকু ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বসিয়াছি, ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আমার আজীবন সহচর সেই অর্দ্ধছিন্ন খট্টায় শুইয়া আছি—আমি কাঁদিব না হাসিব? সুখের স্রোতে অনন্তে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ যেন একটা অজানা দলের পাশে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আর বুঝি কখনও ভাসিয়া যাইতে পাইব না। সব যেন উল্টাইয়া গিয়াছে। জীবনের কেন্দ্র পর্য্যন্ত কে টানিয়া পরিধির বাহিরে লইয়া গিয়াছে। কিছুই যেন আর ঠাহর হয় না! এ কি হইল? নিশীথে সত্যেন্দ্রনাথ জানালায় বসিয়া সাগরপুরের অন্ধকার দেখিতেছিল। গাছগুলা কি একটা নিস্তব্ধভাব সত্যেন্দ্রর সহিত বিনিময় করিতেছিল।

সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ-বাতাস বাহিয়া গেল। কিছু বলিয়া গেল কি? বলিল বৈ কি! সেই এক কথা। সব জিনিসেই সেই এক কথা বলিয়া বেড়ায়! হইয়াছে? পাপিয়া আর চোখ গেল বলে না, ঠিক যেন বলে মরে গেল। বৌ কথা কও পাখীও আর আপনার বোল বলে না। সেও বলে, বৌ মরে গেছে। সব জিনিস ঐ একই কথা বারবার কহিয়া বেড়ায় কেন? সোঁ সোঁ করিয়া নৈশ-বাতাস যেন ঐ কথাই কহে—নেই, নেই, সে নেই!

কেমন আছ সত্য? মাথাটা কি বড় ধরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়? সে ত আজ অনেক দিন হইল! একটু শোও না ভাই। চিরকাল কি একই ভাবে ঐ জানালায় বসিয়া থাকিবে? সত্যেন্দ্র অন্ধকারে নক্ষত্র দেখিতেছিল? যেটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ সেটিকে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল।

চক্ষু মুদিতে সাহস হয় না—পাছে সেটি হারাইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইলে সেইখানেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আবার সেটিকে দেখিবার চেষ্টা করে। আলো ভাল লাগে না। জ্যোৎস্নায় আর আমোদ হয় না! অত ক্ষীণালোকবিশিষ্ট নক্ষত্র কি আলোকে দেখা যায়! সত্যেন্দ্র এম-এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া গিয়াছে। পাশ হইবার ইচ্ছাও আর নাই! উৎসাহও নিবিয়া গিয়াছে, পাশ করিলে কি নক্ষত্র কাছে আসে? হরদেববাবু সপরিবারে দেশে চলিয়া আসিয়াছেন। সত্যেন্দ্র বলে সে বাটী হইতেই ভাল পরীক্ষা দিতে পারিবে। সহরের অত গণ্ডগোলে ভাল পড়াশুনা হয় না। সত্যেন্দ্র এখন একরকমের লোক হইয়া গিয়াছে, মুখখানা দেখিলে বোধ হয়, যেন বহুদিন কিছু খাইতে পায় নাই! যেন মস্ত পীড়া হইতে সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করিয়াছে!

দুপুর-বেলা সত্য ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ফটোগ্রাফ ঝাড়িয়া ধূলা পরিষ্কার করে। নিজের পুরাতন পুস্তকগুলি সাজাইতে বসে; হারমোনিয়মের ঝাঁপ খুলিয়া মিছামিছি পরিষ্কার করে। সরলার পরিষ্কৃত পুস্তকগুলি আরও পরিষ্কার করে; ভাল ভাল কাগজ খাম লইয়া সরলাকে পত্র লিখিয়া কি একটা শিরোনামা দিয়া নিজের বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখে। সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি একা নও। অনেকের কপাল তোমারই মত অল্পবয়সে পুড়িয়া যায়। সকলেই কি তোমার মত পাগল হয়? সাবধান, সত্য! সকলেরই একটা সীমা আছে। স্বর্গীয় ভালবাসারও একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে! যদি সীমা ছাড়াইয়া যাও কষ্ট পাইবে। কেহ রাখিতে পারিবে না। সত্যেন্দ্রর জননী বড় বুদ্ধিমতী। তিনি একদিন স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, সত্য আমার কি হয়ে গেছে দেখছ?

কর্ত্তা বলিলেন, দেখ ছি ত—কিন্তু কি করি?

আবার বিবাহ দাও। ভাল বৌ হ'লে সত্য আবার হাস্‌বে—আবার কথা কবে।

সে দিন সত্য আহার করিতে বসিলে, জননী বলিলেন, আমার একটা কথা শুন্‌বে ?

কি ?

তোমাকে আবার বিবাহ কর্‌তে হবে।

সত্য হাসিয়া কহিল, এই কথা! তা বুড়ো বয়সে আবার ওসব কেন ?

মা পূর্ব্ব হইতেই অশ্রু সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেগুলি এখন বিনা বাক্য-ব্যয়ে নামিতে আরম্ভ করিল। মা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, বাবা, এই একুশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না, কিন্তু সরলার কথা মনে হ'লে এসব আর মুখে আন্‌তে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমি আর একা থাকতে পারি না।

পরদিন প্রাতে হরদেববাবু সত্যেন্দ্রকে ডাকিয়া ঐ কথাই বলিলেন, সত্যেন্দ্র কোন উত্তর দিল না। হরদেববাবু বুঝিলেন, মৌন-ভাব সম্মতির লক্ষণ মাত্র।

সত্যেন্দ্র ঘরে আসিয়া সরলার ফটোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, শুন্‌চ সরো, আমার বিয়ে হবে! ফটোগ্রাফ কথা কহিতে পারে না। পারিলে কি বলিত ? বেশ ত, বলিত কি ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নলিনী

সত্যেন্দ্রর এবার কলিকাতায় বিবাহ হইল। শুভদৃষ্টির সময় সত্যেন্দ্র দেখিল, মুখখানি বড় সুন্দর। হউক সুন্দর সে তথাপি ভাবিল তাহার মাথায় একটা বোঝা চাপিল।

বিবাহের পর দুই বৎসর নলিনী পিতৃ-গৃহে রহিল। তৃতীয় বৎসরে সে শ্বশুর-ভবনে আসিয়াছে, গৃহিণী নূতন বধূর চাঁদ-পানা মুখ দেখিয়া আবার সরলাকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন, আবার সংসার পাতিবার চেষ্টা করিলেন। রাত্রে যখন দুইজনে পাশা-পাশি শুইয়া থাকে, তখন কেহই কাহারও সহিত কথা কহে না।

নলিনী ভাবে, কেন এত অযত্ন?

সত্য ভাবে, এ কোথাকার কে যে আমার সরোর জায়গায় শুইয়া থাকে?

নূতনবধূ লজ্জায় স্বামীর সহিত কথা কহিতে পারে না—সত্যেন্দ্র ভাবে, কথা কহে না ভালই!

একদিন রাত্রে সত্যেন্দ্রর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে, সে দেখিল, শয্যায় কেহ নাই। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল কে একজন জানালায় বসিয়া আছে। জানালা খোলা। খোলা পথে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছে, সেই আলোকে সত্যেন্দ্র নলিনীর মুখের কিয়দংশ দেখিতে পাইল, ঘুমের ঘোরে জ্যোৎস্নার আলোকে মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইল।

কান পাতিয়া সে শুনিল, নলিনী কাঁদিতেছে।

সত্য ডাকিল, নলিনী—

নলিনী চমকিয়া উঠিল। স্বামী আহ্বান করিয়াছেন! অন্য মেয়ে কি করিত জানি না, কিন্তু নলিনী ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে বসিল।

সত্যেন্দ্র বলিল, কাঁদ্‌চ কেন?—কাঁদ্‌চ কেন? অশ্রুবেগ দ্বিগুণ মাত্রায় বহিতে লাগিল, তাহার ষোল বৎসর বয়সে স্বামীর এই আদরের কথা!

অনেকক্ষণ চাপিয়া চাপিয়া কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, তুমি আমাকে দেখ্‌তে পার না কেন?

কি জানি কেন! সত্যরও বড় কান্না আসিতেছিল। তাহা রোধ করিয়া সে বলিল, দেখ্‌তে পারি না তোমাকে কে বল্‌লে? তবে যত্ন কর্‌তে পারি না।

নলিনী নিরুত্তরে সকল কথা শুনিতে লাগিল।

সত্যেন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, ভেবেছিলাম এ কথা কাকেও বল্‌ব না, কিন্তু না বলেও কোন লাভ নাই, তোমাকে কিছু গোপন কর্‌ব না। সকল কথা খুলে বল্‌লে বুঝ্‌তে, আমি এমন কেন! আমি এখনও সরলাকে—আমার পূর্ব্ব স্ত্রীকে—ভুল্‌তে পারি নি। ভুল্‌ব, এমন ভরসাও করি না, ইচ্ছাও করি না। তুমি হতভাগ্যের হাতে পড়েছ—তোমাকে কখনও সুখী করতে পারব এ আশা মনে হয় না। নিজের ইচ্ছায় তোমাকে বিবাহ করি নি—নিজের ইচ্ছায় তোমাকে ভালবাস্‌তে পারব-না! গভীর নিশীথে দুই জনে অনেকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া রহিল। সত্যেন্দ্র বুঝিতে পারিল, নলিনী কাঁদিতেছে। সে কাঁদিয়াছিল কি? একে একে সরলার কথা মনে পড়িতে লাগিল, ধীরে ধীরে সেই মুখখানি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—সেই "নিতে এসেছ?" মনে পড়িল। অনাহূত অশ্রু সত্যেন্দ্রর নয়ন রোধ করিল, তাহার পর গণ্ড বাহিয়া ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িল।

চক্ষু মুছিয়া সত্যেন্দ্র ধীরে ধীরে নলিনীর হাত দুটি আপনার হাতে

লইয়া বলিল, কেঁদ না নলিনী, আমার হাত কি? নিশি দিন অন্তরে আমি কি যন্ত্রণাই যে ভোগ করি তা কেউ জানে না। মনে বড় কষ্ট। এ কষ্ট যদি কখনও যায়, তা হ'লে হয় ত তোমাকে ভালবাস্‌তে পার্‌বো; হয় ত তোমাকে আবার যত্ন কর্‌তে পার্‌বো।

এই বিষাদপূর্ণ স্নেহমাখা কথার মূল্য কয়জন বুঝে? নলিনী বড় বুদ্ধিমতী; সে স্বামীর কষ্ট বুঝিল। স্বামী তাহাকে ভালবাসে না, এ কথা সে তাঁহার মুখে শুনিল; তথাপি তাহার অভিমান হইল না। বোকা মেয়ে। ষোল বৎসরে যদি অভিমান করিবে না তবে করিবে কবে? কিন্তু নলিনী ভাবিল, অভিমান আগে, না স্বামী আগে?

সেই দিন হইতে কি করিলে স্বামীর কষ্ট যায়, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। কি করিলে স্বামী সতীনকে ভুলিতে পারেন, এ কথা সে একবারও ভাবিল না! ব্যথার যদি কেহ ব্যথী হয়, কষ্টতে যদি কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে, দুঃখের কথা যদি কেহ আগ্রহ করিয়া শ্রবণ করে, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার ন্যায় বন্ধু এ জগতে আর নাই। ইহার পর সত্যেন্দ্র নলিনীকে প্রায়ই পূর্ব্বের কথা জানাইত। কত নিশা দুইজনের সেই একই কথায় অবসান হইত। সত্যেন্দ্র যে কেবল বলিত, তাহা নহে, নলিনী আগ্রহের সহিত স্বামীর পূর্ব্ব ভালবাসার কথা শুনিতে ভালও বাসিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর পরে

দুই বৎসর গত হইয়াছে, নলিনীর বয়স এখন আঠার বৎসর, তাহার আর পূর্ব্বের মত কষ্ট নাই। স্বামী এখন আর তাহাকে অযত্ন করেন না। স্বামীর ভালবাসা জোর করিয়া সে লইয়াছে। যে জোর করিয়া কিছু লইতে জানে সে তাহা রাখিতেও জানে, তাহার এখন আর কোন কষ্টই নাই। সত্যেন্দ্রনাথ এখন পাবনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। স্ত্রীর যত্নে, স্ত্রীর ঐকান্তিক ভালবাসায় তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাছারির কর্ম্মের অবকাশে সে এখন নলিনীর সহিত গল্প করে, উপহাস করে, গান-বাজনা করিয়া আমোদ পায়। এক কথায় সত্যেন্দ্র অনেকটা মানুষ হইয়াছে। মানুষ যেটা পায় না, সেইটাই তাহার অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্য চরিত্রই এমনি। তুমি অশান্তিতে আছ শান্তি খুঁজিয়া বেড়াও—আমি শান্তিভোগ করিতেছি, তবুও কোথা হইতে যেন অশান্তিকে টানিয়া বাহির করি।

ছল ধরা যেন মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ ভাব। যে মাছটা পলাইয়া যায়, সেইটাই কি ছাই বড় হয়! সত্যেন্দ্রনাথও মানুষ। মানুষের স্বভাব কোথায় যাইবে? এত ভালবাসা, যত্ন ও শান্তির-মধ্যে তাহার হৃদয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত অশান্তি জাগিয়া উঠে। নিমিষের মধ্যে মনের মাঝে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার মত যে বিপ্লব বাধিয়া যায়, তাহা সামলাইয়া লইতে নলিনীর অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, বুঝি আর সে সামলাইতে পারিবে না। এত দিনের চেষ্টা, যত্ন অধ্যবসায় সমস্তই বুঝি বিফল হইয়া যাইবে। নলিনীর এতটুকু ত্রুটি

দেখিলে, সত্যেন্দ্র ভাবে সরলা থাকিলে বোধ হয় এমনটি হইত না। হইত কি না ভগবান জানেন, হয়ত হইত না; হয়ত ইহা অপেক্ষা চতুর্গুণ হইত! কিন্তু তাহাতে কি? সে মৎস্য যে পলাইয়া গিয়াছে! সত্যেন্দ্র এখনও সরলাকে ভুলিতে পারে নাই। কাছারী হইতে আসিয়াই যদি নলিনীকে সে না দেখিতে পায়, অমনই মনে করে কিসে আর কিসে!

নলিনী বড় বুদ্ধিমতী, সে সর্ব্বদা স্বামীর নিকটে থাকে, কারণ সে জানিত, এখনও তিনি সরলাকে ভুলেন নাই। একেবারে ভুলিয়া যান, এ ইচ্ছা নলিনীর কখনও মনে হয় না; তবে অনর্থক মনে করিয়া কষ্ট না পান, এই জন্যই সে সর্ব্বদা কাছে থাকিত, যত্ন করিত। নাই ভুলুন, কিন্তু তাহাকে ত অযত্ন করেন না—ইহাই নলিনীর ঢের।

গোপীকান্ত রায় পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত উকীল। কলিকাতায় তাঁহার বাটী নলিনীদের বাটীর কাছে। কি একটা সম্বন্ধ থাকায় নলিনী তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকে। রায়খুড়িমা প্রায় প্রত্যহই সত্যেন্দ্রর বাটী বেড়াইতে আসেন। গোপীবাবুও প্রায় আসেন। গ্রাম-সম্পর্কে খুড়-শ্বশুরকে সত্যেন্দ্রনাথ অতিশয় মান্য করেন। সত্যেন্দ্রর বাসা তাঁহার বাটী হইতে দূরে হইলেও উভয় পরিবারে বেশ মেলামেশি হইয়া গিয়াছে।

নলিনীও মধ্যে মধ্যে কাকার বাড়ী বেড়াইতে যায়, কারণ একে কাকার বাড়ী তাহাতে গোপীবাবুর কন্যা হেমার সহিত তাহার বড় ভাব, বাল্যকালের সখী, কেহ কাহাকে ছাড়িতে চাহে না। সেদিন তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র কাছারী চলিয়া গিয়াছে, কোন কর্ম্ম নাই দেখিয়া নলিনী ছবি আঁকিতে বসিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গড় গড় করিয়া একখানা গাড়ী ডেপুটীবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া লাগিল।

কে আসিল? হেম বুঝি? আর ভাবিতে হইল না। বিষম কোলাহল করিতে করিতে হেমাঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমা আসিয়া

একেবারে নলিনীর চুল ধরিল, কহিল, আর লেখা-পড়ার দরকার নেই, ওঠ, আমাদের বাড়ী চল, কাল দাদার বৌ এসেছে।

নলিনী কহিল, বৌ এসেছে সঙ্গে আন্‌লে না কেন?

হেম কহিল, তা কি হয়? নূতন এসেছে, হঠাৎ তোর এখানে আস্‌বে কেন?

নলিনী কহিল, আমিই বা তবে যাব কেন? হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, তোর ঘাড় যাবে, এই আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইলে নলিনী কেন, অনেককেই যাইতে হইত! নলিনীকেও যাইতে হইল।

যাইতে নলিনীর বিশেষ আপত্তি ছিল, কারণ তাহাদের বাটী যাইলে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইত। দুই-এক দিন নলিনীর বাটী ফিরিবার পূর্ব্বেই সত্যেন্দ্রনাথ কাছারী হইতে ফিরিয়াছিলেন। সেরূপ অবস্থায় সত্যেন্দ্রর বড় অসুবিধা হইত। তিনি কিছু মনে করুন আর নাই করুন, নলিনীর বড় লজ্জা করিত, কারণ সে জানিত, কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাতের বাতাস না খাইলে স্বামীর গরম ছুটিত না। বিধাতার ইচ্ছা—বহু চেষ্টায় আজও নলিনী সাতটার পূর্ব্বে ফিরিতে পারিল না। আসিয়া সে দেখিল, সত্যেন্দ্র সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে, তখনও কিছু আহার করে নাই। খাওয়াইবার ভার নলিনী আপন হস্তেই রাখিয়া ছিল। কাছে আসিলে সত্যেন্দ্র হাসিল, কিন্তু সে হাসি নলিনীর ভাল বোধ হইল না। সে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। আসন পাতিয়া নলিনী জলখাবার খাওয়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সত্যেন্দ্র কিছু স্পর্শ করিল না। ক্ষুধা একেবারেই নাই। বহু সাধ্যসাধনাতেও সে কিছু খাইল না। নলিনী বুঝিল, এ অভিমান কেন?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কপাল ভাঙ্গিয়াছে কি ?

আজ হেমাঙ্গিনী শ্বশুরবাড়ী যাইবে। তাহার স্বামী উপেন্দ্রবাবু তাহাকে লইতে আসিয়াছেন। নলিনী বহু দিবস হেমার সহিত দেখা করিতে যায় নাই। তাই আজ হেমা অনেক দুঃখ করিয়া তাহাকে যাইতে লিখিয়াছে।

নলিনী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, স্বামীর অনুমতি বিনা সে আর কোথাও যাইবে না; কিন্তু আজ সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গেলে, প্রিয়-সখীর সহিত আর দেখা হয় না। নলিনী বড় বিপদে পড়িল। হেমা লিখিয়াছে, তাহারা তিনটার ট্রেণে রওনা হইবে। তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লওয়া কি করিয়া হয়? বহু কু-তর্কের পর নলিনী যাওয়াই স্থির করিল। যাইবার সময় দাসীকে সে বলিয়া দিল, যেন ঠিক তিনটার সময় রায়েদের বাড়ীতে গাড়ী পাঠান হয়। গাড়ী পাঠানও হইয়াছিল, কিন্তু হেমার তিনটার ট্রেণে যাওয়া হইল না। সুতরাং সে নলিনীকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না। অনেক জিদ করিয়াও সে হেমার হাত এড়াইতে পারিল না। হেমা আজ অনেক দিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে! কত কাল আর দেখা হইবে না—সহজে কে ছাড়িয়া দেয়?

বাটী ফিরিতে বিলম্ব হইলে স্বামী রাগ করিবেন এ কথা বলিতে নলিনীর লজ্জা হইতেছিল—সহজে এ কথা কে বলিতে চাহে? এ হীনতা কে স্বীকার করে? বিশেষ এই বয়সে! অবশেষে সে কথাও সে বলিল, কিন্তু হেমা তাহা বিশ্বাস করিল না। সে হাসিয়া বলিল, বোকা বুঝিও

না। রাগারাগির ব্যাপার আমি ঢের বুঝি। উপেনবাবুও অনেক রাগ কর্‌তে জানেন।

কথাটা হেমা হাসিয়া উড়াইয়া দিল; কিন্তু নলিনী মর্ম্মে পীড়া পাইল। সকলের স্বামী কি এক ছাঁচে গড়া? সকলেই কি উপেনবাবুর মত?

নলিনী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আসিয়া সে শুনিল, বাবু বাহিরে শয়ন করিয়াছে।

মাতঙ্গিনী ওরফে মাতু, নলিনীর বাপের বাড়ীর ঝি, সে নলিনীর সহিত আসিয়াছিল। অনেক দিনের লোক, বিশেষ সে নলিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত, তাই সে নলিনীকে আজ বিলক্ষণ দশ কথা জানাইয়া দিল। বাটীর মধ্যে সেই কেবল জানিত, সত্যবাবু বিলক্ষণ রাগ করিয়াই বাহিরে শয্যা রচনা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

গভীর রাত্রে যখন শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, যখন সেই বহুদিনগত প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ সরলার মুখের সহিত নলিনীর মুখের ঈষৎ সাদৃশ্য আছে কি না বিবেচনা করিতেছিল, যখন সরলার ভালবাসার নিকট নলিনীর ভালবাসা, সাগরের নিকট গোষ্পদের জল, ধারণা করিবার জন্য মনের মধ্যে বিষম ঝটিকার উৎপত্তি করিতেছিল, তখন ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া নলিনী সে গৃহে প্রবেশ করিল। সত্যেন্দ্র চাহিয়া দেখিল নলিনী। নলিনী আসিয়া সত্যেন্দ্রর পদতলে বসিল। সত্যেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল। বহুক্ষণ এই ভাবেই কাটিয়া গেল দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইল, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পুরুষভাবে স্পষ্ট স্বরে কহিল, তুমি এখানে কেন?

নলিনী কাঁদিতেছিল, কথা কহিতে পারিল না। কান্না দেখিয়া ডেপুটিবাবু আর একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিল, রাত হয়েছে, যাও, ভিতরে

গিয়ে শোও গে। নলিনী কাঁদিতেছিল; এবার চক্ষের জল মুছিয়া সে বলিল, তুমি শোবে চল।

সত্য ঘাড় নাড়িল, বলিল, আমার বড় ঘুম পেয়েছে, আর উঠতে পারব না।

কাঁদিলে সত্যেন্দ্র বিরক্ত হয়। নলিনী চক্ষের জল মুছিয়াছে; স্বামীর কাছে আর সে কাঁদিবে না। ধীরে ধীরে পায়ের উপর হাত রাখিয়া নলিনী বলিল, এবার আমাকে ক্ষমা কর। এখানে তোমার বড় কষ্ট হবে, ভিতরে চল।

সত্যেন্দ্র আর ভিতরে যাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সে বলিল, কষ্টের কথা এত রাত্রে আর ভেবে কাজ নেই; তুমি শোও গে, আমিও ঘুমোই।

নলিনী সত্যেন্দ্রকে চিনিত। সমস্ত রাত্রি সে আপনার ঘরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাইল। বলি, ও হেমাঙ্গিনী, একবার দেখিয়া গেলে না? রাগা-রাগির ব্যাপার তুমি বোঝ ভাল—একবার মিটাইয়া দিবে না কি? পরদিনও সত্যেন্দ্র বাটীর ভিতর আসিল না, বা নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

নলিনীর একখানা পত্র মাতু সত্যেন্দ্রর হাতে দিয়াছিল। সে সেখানা না পড়িয়াই মাতঙ্গিনীর সম্মুখে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, এ সব আর এনো না।

চারি-পাঁচ দিন পরে একদিন নলিনীর বড় দাদা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবাবু পাবনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। হঠাৎ দাদাকে দেখিয়া নলিনী অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু ততোধিক বিস্মিত হইল।

দাদা যে?

নরেন্দ্রবাবু নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাড়ী যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিস্ কেন বোন?

ব্যস্ত? কথাটার অর্থ নলিনী তখনই বুঝিয়া ফেলিল। হাসিয়া সে বলিল, তোমাদের যে অনেক দিন দেখি নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভঙ্গিয়াছে

যেদিন স্বামীর চরণে প্রণিপাত করিয়া নলিনী দাদার সহিত গাড়ীতে উঠিল, সে রাত্রে সত্যেন্দ্রনাথ একটুও ঘুমাইতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সত্যেন্দ্র ভাবিতেছিল, এতটা না করিলেও চলিতে পারিত। অনেক বার সত্যর মনে হইয়াছিল, এখনও সময় আছে, এসময়ও গাড়ী ফিরাইয়া আনি। কিন্তু হায় রে অভিমান! তাহারই জন্য নলিনীকে ফিরাইয়া আনা হইল না।

যাইবার সময় মাতুও সঙ্গে গিয়াছিল। সেই কেবল যাইবার যথার্থ কারণ জানিত। নলিনী মাতুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল, যেন সে বাটীতে কোন কথা না বলে। নলিনী মনে করিল, এ কথা প্রকাশ করিলে স্বামীর অপযশ করা হইবে। ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহার স্বামীকে লোকে মন্দ বলিবার কে?

পিতৃ-গৃহে যাইয়া নলিনী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিল, ছোট ভাইটিকে কোলে লইল, শুধু সে হাসিতে পারিল না।

মা বলিলেন, নলিনী আমার একদিনের গাড়ীর পরিশ্রমে একেবারে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সে শুষ্ক মুখ আর প্রফুল্ল হইল না।

পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায়, একটা সামান্য কারণ হইতে গুরুতর অনিষ্টের উৎপত্তি হয়। শূর্পণখার ঈষৎ চিত্ত-চাঞ্চল্যই স্বর্ণ-লঙ্কা ধ্বংসের হেতু হইয়াছিল। অকিঞ্চিৎকর রূপলালসার জন্য শুধু ট্রয় নগর ধ্বংস হইয়া গেল। মহানুভব রাজা হরিশ্চন্দ্র অতি সামান্য কারণেই অমন বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন; জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এখানেও

একটা সামান্য অভিমানে বিষম বিপত্তি ঘটিয়া উঠিল। সত্যেন্দ্রনাথের দোষ দেব কি ?

নলিনী কখনো অভিমান করে নাই, স্বামীর কষ্টের কথা মনে করিয়া সে নিরবে সমস্ত সহ্য করিত—আর পারিল না। সে ভাবিল, এই ক্ষুদ্র কারণে যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সে মরে না কেন ?

দারুণ অভিমানে নলিনী শুকাইতে লাগিল; ওদিকে সত্যেন্দ্রর অভিমান ফুরাইয়া গিয়াছে; একদণ্ড না থাকিলে যাহার চলে না, তাহার এ মিছা অভিমান কতদিন থাকে? অভিমান দারুণ কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যেন্দ্র প্রত্যহ চাহিয়া থাকে—আজ হয়ত নলিনীর পত্র আসিবে, হয়ত সে লিখিবে, আমায় লইয়া যাও, সত্যেন্দ্র ভাবে, তাহা হইলে মাথায় করিয়া লইয়া আসিব, আর কখনও এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিব না; কিন্তু ভবিতব্য কে অতিক্রম করিবে? যাহা হইবার, তাহা হইবেই। তুমি আমি ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্র, আজ কাল করিয়া ছয় মাস কাটিয়া গেল, হতভাগিনী কোন কথা লিখিল না। পাপিষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ ভাঙ্গিল, কিন্তু মচকাইল না। ছয়মাস কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ সত্যেন্দ্রনাথের অসহ্য হইল। লুপ্ত অভিমান আবার দৃপ্ত হইয়া উঠিল, ক্রোধ আসিয়া তাহাতে যোগ দিল। হিতাহিত-রহিত সত্যেন্দ্রনাথ নিজের দোষ দেখিল না, ভাবিল, যাহার অহঙ্কার এত, তাহার প্রতিশোধও তদ্রূপ প্রয়োজন।

কেহই নিজের দোষ দেখিল না। সেই অর্দ্ধ-মিলিত হৃদয় দুইটি আবার চিরকালের জন্য বিভিন্ন হইয়া চলিল। যৌবনের প্রারম্ভে সঙ্কুচিতা লতাকে টানিয়া বাড়াইয়াছিল, কিন্তু আর সহে না, এবার ছিঁড়িবার উপক্রম হইল।

সত্যেন্দ্রনাথ! তোমার দোষ দিই না, তাহারও দিই না। দুই জনেই ভুল করিয়াছ, দোষ কর নাই। ভুল দেখাইতে পারিলে আত্মগ্লানি

কাহার যে অধিক হইত, তাহা ভগবানই জানেন। আমরাও বুঝিতে পারিতাম না, তোমরাও পারিতে না। বুঝিতে পারি না—কি আকাঙ্ক্ষায়, কি সাধ পূর্ণ করিতে তোমরা এতটা করিলে!

সাধ মিটে না; মিটাইবার ইচ্ছাও নাই। কি সাধ তাহাও হয় ত ভাল বুঝিতে পারি না। তথাপি কাতর হৃদয় কি একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় সকল সময়ই হা হা করিয়া উঠে। কি যে হয়, কেন যে অদৃশ্য গতি ঐ লক্ষ্যহীন প্রান্তে পরিচালিত হয়, কিছুতেই তাহা নির্ণয় করা যায় না।

যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবে। ইচ্ছা হইলেও মনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াও তোমাকে অপরাধ হইতে অব্যাহতি দিব। দিব কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলশয্যা

অমন রূপে-গুণে বৌ, পুত্রের পছন্দ হয় না! গৃহিণীর বড় দুঃখ। অমন চাঁদপানা বৌ লইয়া ঘর করিতে পাইলেন না ভাবিয়া গৃহিণী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া আছেন। জননীর শত চেষ্টাতেও পুত্রের মত ফিরিল না। এখন আর উপায় কি? ছেলেরই যদি পছন্দ হইল না, তখন কিসের বৌ? ছেলের আদরেই ত বৌয়ের আদর! আর আমারই বা হাত কি? নিজে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিলে আমি কি আটকাইতে পারি? ইত্যাদি মৃদু বচন আওড়াইতে আওড়াইতে, অভ্যাসানুসারে গৃহিণী বরণ-ডালা সাজাইতে বসিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে হরদেববাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। সে কথা স্মরণ হইল—চক্ষে জল আসিল, আবার নলিনীর কথা মনে পড়িলে—জলবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। কি জানি কেমন বৌ আসিবে? কর্ত্তা বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় পোড়াকপালির এ দুরবস্থা দেখিতে হইত না।

সত্যেন্দ্র বিবাহ করিয়া আসিল। মা বৌ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। আবার পোড়া চোখে জল আসিল। জল মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন, চোখে কি পড়েছে, কেবল জল আসছে। গিরিবালা বড় মুখফোঁড় মেয়ে—বিশেষ নলিনীর সহিত তাহার বেহান পাতান ছিল, সে বলিয়া ফেলিল, এই বয়সে তিনবার, আরও কতবার চোখে কি পড়বে কে জানে? কথাটা গৃহিণী শুনিলেন, সত্যরও কানে গেল। কাল সাধের ফুলশয্যা।

কোথা হইতে একটা ভারি জমকাল রকম তত্ত্ব আসিয়াছে। বর-কনের ঢাকাই শাড়ি, ধুতি, চাদর ইত্যাদি বড় সুন্দর রকমের। কনের বারাণসী চেলিখানির মত সুন্দর চেলি গ্রামে ইতিপূর্ব্বে কেহ দেখে নাই।

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোথাকার তত্ত্ব? মা এক-একবার ঢোক গিলিয়া বলিতেছেন, সত্যর কে একজন বন্ধু পাঠিয়েছে।

গৃহিণী চক্ষের জল চাপিয়া, যথার্থ সংবাদ চাপিয়া হাসিকান্নামিশ্রিত মুখে তত্ত্বের মিষ্টান্নাদি বণ্টন করিলেন।

সকলে যে যাহার ভাগ লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় রাজবালা বলিল, বেশ তত্ত্ব করেছে! নৃত্যকালী বলিল, তা আর হবে না? বড়লোক তত্ত্ব পাঠালে এমনই পাঠায়। ক্রমশঃ এ কথা চাপা পড়িল। তখন যোগমায়া বলিল, আচ্ছা, আবার বিয়ে করলে কেন? জ্ঞানদা কহিল, কি জানি বোন, অমন রূপে-গুণে বৌ! কে জানে, ওসব বোঝা যায় না।

রামমণি জাতিতে নাপিতের কন্যা; তবে অবস্থা ভাল, দেখিতেও মন্দ নহে, এই নাকটি সামান্য চাপা মাত্র। কোন কোন পরশ্রীকাতর লোক তাহার চক্ষেরও দোষ দিত, বলিত, হাতীর চোখের চেয়েও ছোট।

যাক্ এ নিন্দাবাদে আমাদের প্রয়োজন নাই। রামমণি একটু হাসিয়া বলিল, তোমাদের ঘটে যদি বুদ্ধি থাকত তা হ'লে কি আর ও কথা বল? ছুঁড়ী সদা সর্ব্বদা যে ফিক্ ফিক্ করে হেসে কথা বলত, তাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, স্বভাব চরিত্র মন্দ লো, স্বভাব চরিত্র মন্দ। না হ'লে চাকরি স্থান থেকে তাড়িয়ে দেয়? আবার বে করে? মুখে কিছু না বলিলেও কথাটা অনেকের মতের সহিত মিলিল।

ইহার দুই-একদিন পরে, গ্রামের প্রায় সকলেই জানিল যে রামমণি জমিদারের বাটীর গূঢ় রহস্য ভেদ করিয়াছে। নাপিতের মেয়ে না হইলে এত বুদ্ধি কি বামুন-কায়েতের মেয়ের হয়? কথাটা অনেকেই স্বীকার করিল।

এবার গৃহিণীর পালা। এ কথা যখন তাঁহার কানে গেল, তিনি ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া একেবারে ভূমে লুটাইয়া পড়িলেন। আমার নলিনী

কুলটা! কি জানি কেন গৃহিণী সরলা অপেক্ষা নলিনীকে অধিক ভাল-বাসিয়াছিলেন। জন্মের মত সেই নলিনীর কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গৃহিণী মনে মনে ভাবিলেন, সত্য হয় ভালই—না হয় আমি নলিনীকে লইয়া কাশীবাসী হইব। পোড়াকপালির এজন্মের মত সব সাধই ত মিটিয়াছে।

তখন তিনি দ্বার খুলিয়া মাতুকে ডাকিয়া আনিয়া আবার দ্বার বন্ধ করিলেন। মাতুই তত্ত্ব লইয়া আসিয়াছিল।

দুইজনের চক্ষুজলের বহু বিনিময় হইল। কেমন করিয়া নলিনীর সোণার বর্ণ কালি হইয়াছে, কি অপরাধে সত্যেন্দ্র তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছে, কত কাতর বচনে সে ঠাকুরাণীকে প্রণাম জানাইয়াছে ইত্যাদি বিবরণ মাতঙ্গিনী বেশ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহিণীকে শুনাইল। শুনিতে শুনিতে গৃহিণীর পূর্ব্ব স্নেহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, পুত্রের উপর দারুণ অভিমান জন্মিল। মনে মনে তিনি ভাবিলেন, আমি কি সত্যর কেহ নহি? সকল কথাই কি আমার উপেক্ষার যোগ্য? আমার কি একটা কথাও থাকিবে না? আমি আবার নলিনীকে গৃহে আনিব। অমন লক্ষ্মীর কি এ দশা করিতে আছে? সেইদিন সন্ধ্যার সময় জননী পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, নলিনীকে নিয়ে এস।

পুত্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

জননী কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, ওরে আমার নলিনীর নামে গ্রামময় কলঙ্ক রট্‌চে যে, তুই তার স্বামী—তার মান রাখ্‌বিনি।

কিসের কলঙ্ক?

অমন ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করলে আমি কার মুখ বন্ধ করব?

মুখ বন্ধ ক'রে কি হবে?

তবু আন্‌বিনি ?

না।

জননী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন, কিরূপ ক্রুদ্ধা হইতে হইবে এবং তখন কি কথা বলিতে হইবে তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং কিছু ভাবিতে হইল না, বলিলেন, তবে কালই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও। আমি এখানে একদণ্ডও আর থাক্‌তে চাই না।

সত্য আর সে সত্য নাই! সরলার আদরের ধন, ক্রীড়ার দ্রব্য সখের জিনিস—অন্যমনস্ক, উচ্চমনা, সরল-হৃদয়, প্রফুল্লবদন স্বামী, নলিনীর বহু যত্নের বহু ক্লেশের, মনের মত সত্যেন্দ্রনাথ আর নাই। সেও বুকে পাষাণ চাপাইয়াছে, লজ্জা সরম হিতাহিত জ্ঞান সকলই হারাইয়াছে—সে অনায়াসে বলিল, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় যাও। আমি আর কাকেও আন্‌তে পার্‌ব না।

সত্যর মুখে একথা শুনিবেন, মা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় একবার বলিলেন, বৌ আমার কুলটা নয় তা বেশ জেনো। গ্রামের লোকে যা ইচ্ছা হয় বলে, কিন্তু আমি কখনও তা বিশ্বাস কর্‌ব না।

পরদিন পিসিমা সত্যেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার এক বন্ধু তোমাকে তত্ত্ব করেছে, দেখেছ কি ?

সত্য ঘাড় নাড়িল। বলিল, না, কে বন্ধু ?

জানি না! ব'স, কাপড়গুলা নিয়ে আসি।

অল্পক্ষণ পরে পিসিমা একতাড়া কাপড় লইয়া আসিলেন। সত্য দেখিল, বেশ মূল্যবান বস্ত্র; সে বিস্মিত হইল। কোন্ বন্ধু পাঠাইয়াছে ? চেলিখানি বেশ করিয়া দেখিতে দেখিতে সে লক্ষ্য করিল, এক কোণে কি একটা বাঁধা আছে। খুলিয়া দেখিল, একখানা ক্ষুদ্র পত্র।

হস্তাক্ষর দেখিয়া সত্যেন্দ্রর মাথা ঝাঁৎ করিয়া উঠিল।

লেখা আছে—

ভগিনী, স্নেহের উপহার প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। তোমার দিদি যাহা পাঠাইল, গ্রহণ করিও।

* * *

সে রাত্রের ফুলশয্যা সত্যেন্দ্রর পক্ষে কণ্টকশয্যা হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রবাবুর পত্র

যুবার অভিমান কোন বালকে দেখিয়াছ কি? সত্যেন্দ্রর ন্যায় অভিমান করিয়া এতটা অনর্থপাত করিতে কোন বালককে দেখিয়াছ কি? ছেলে-বেলায় পুস্তক লইয়া খেলা করিতাম বলিয়া পিতার নিকট শাস্তি ভোগ করিয়াছি। সত্যেন্দ্রনাথ! তুমি হৃদয় লইয়া খেলা করিয়াছ, শাস্তি পাইবে ভয় হয় কি?

তোমরা যুবা; সমস্ত সংসারটাই তোমাদের সুখের নিকেতন; কিন্তু বল দেখি, তোমাদের কাহারও কি এমন একটা সময় আসে নাই—যখন প্রাণটা বাস্তবিকই ভার বোধ হইয়াছে? যখন জীবনের প্রত্যেক গ্রন্থিগুলি শ্লথ হইয়া ক্লান্ত ভাবে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে? না হইয়া থাকে একবার সত্যেন্দ্রনাথকে দেখ। ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে ঘৃণা কর। ঘৃণা কর, সহানুভূতি প্রকাশ করিও না! ঘৃণা কর, কিছু বলিবে না; দয়া করিও না, মরিয়া যাইবে!

পাপী যদি মরিয়া যায়, প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিবে কে? সত্যেন্দ্র শ্রান্ত জীবনের প্রত্যেক দিন এক একটা দুঃসহ বোঝা লইয়া আসে। সমস্ত দিন ছটফট করিয়াও যেন সে বোঝা আর নামাইতে পারে না!

সত্যেন্দ্রর মাঝে মাঝে বোধ হয় যেন সে তাহার অতীত জীবন সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; শুধু কিছুতেই ভুলিতে পারে না তাহার সাধের নলিনী পাবনায় চরিত্রহীনা হইয়াছিল, তাই সে তাহার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

প্রায় দুই মাস গত হইল, সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে, আজ এক-খানা পত্র ও একটী ছোট পার্শ্বেল আসিয়া সত্যেন্দ্রর নিকট পৌছিল।

পত্রটী নলিনীর দাদা নরেন্দ্রবাবুর, সেখানি এই—

সত্যেন্দ্রবাবু,

অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে আপনাকে পত্র লিখিতেছি, সে কেবল আমার প্রাণাধিকা ভগিনী নলিনীর জন্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছে, যেন এই অঙ্গুরীয়টী আপনার নিকট পুনঃ প্রেরিত হয়। আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টী পাঠাইলাম। ভগিনীর ইচ্ছা ছিল এইটী আপনার নূতন স্ত্রীকে পরাইয়া দেন, ভরসা করি তাহার আশা পুরিবে! আর মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুনয় করিয়া গিয়াছে, যেন তাহার ছোট ভগিনীটী ক্লেশ না পায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ

নলিনীর যখন একটি ছোট পুত্র সন্তান হইয়া মরিয়া যায়, সত্যেন্দ্রনাথ এই অঙ্গুরীয়টি তাহার হস্তে পরাইয়া দিয়াছিলেন; সে কথা মনে পড়িয়াছিল কি?

* * * *

সত্যেন্দ্রনাথ আর পাবনায় যান নাই। যে কারণেই হৌক মাতা-ঠাকুরাণী আর কাশীবাসী হইতে পারিলেন না। নূতন বধূর নাম ছিল বিধু। বিধু বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে নলিনীর ভগিনী ছিল।

অনুপমার প্রেম

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরহ

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে অনুপমা নবেল পড়িয়া পড়িয়া মাথাটা একেবারে বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে। সে মনে করিল, মনুষ্য-হৃদয়ে যত প্রেম, যত মাধুরী, যত শোভা, যত সৌন্দর্য্য, যত তৃষ্ণা আছে, সব খুঁটিয়া বাছিয়া একত্রিত করিয়া নিজের মস্তিষ্কের ভিতর জমা করিয়া ফেলিয়াছে; মনুষ্য-স্বভাব, মনুষ্য-চরিত্র তাহার নখদর্পণ হইয়াছে! জগতের শিখিবার পদার্থ আর তাহার কিছুই নাই; সব জানিয়া ফেলিয়াছে, সব শিখিয়া ফেলিয়াছে। সতীত্বের জ্যোতিঃ সে যেমন দেখিতে পায়, প্রণয়ের মহিমা সে যেমন বুঝিতে পারে, জগতে আর যে কে তেমন সমাজদার আছে, অনুপমা তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। অনু ভাবিল, সে একটী মাধবীলতা; সম্প্রতি মুঞ্জরিয়া উঠিতেছে; এ অবস্থায় আশু সহকার-শাখা-বেষ্টিতা না হইলে, ফোট ফোট কুঁড়িগুলি কিছুতেই পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিবে না। তাই খুঁজিয়া পাতিয়া একটি নবীনকান্তি-সহকার মনোনীত করিয়া লইল এবং দুই-চারি দিবসেই তাহাকে মন-প্রাণ জীবন-যৌবন সব দিয়া ফেলিল। মনে মনে মন দিবার বা নিবার সকলেরই সমান অধিকার, কিন্তু জড়াইয়া ধরিবার পূর্ব্বে সহকারটার মতামতেরও ঈষৎ প্রয়োজন হয়। এইখানেই মাধবীলতা কিছু বিপদে পড়িয়া গেল। নবীন নীরোদ কান্তকে সে কেমন করিয়া জানাইবে যে, সে তাহার মাধবী-

লতা—স্ফুটনোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে আশ্রয় না দিলে এখনই কুঁড়ির ফুল লইয়া মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে প্রাণত্যাগ করিবে।

কিন্তু সহকার এত জানিতে পারিল না। না জানুক অনুপমার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অমৃতে গরল, সুখে দুঃখ, প্রণয় বিচ্ছেদ চিরপ্রসিদ্ধ। দুই-চারি দিবসে অনুপমা বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিত তনু হইয়া মনে মনে বলিল, স্বামিন্, তুমি আমাকে লও বা না লও, ফিরিয়া চাহ বা না চাহ, আমি তোমার চিরদাসী। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ জন্মে না পাই, আর জন্মে নিশ্চয়ই পাইব; তখন দেখিবে, সতী সাধ্বীর ক্ষুদ্র বাহুতে কত বল! অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, বাটীসংলগ্ন উদ্যানও আছে, মনোরম সরোবরও আছে; সেথা চাঁদও ওঠে, পদ্মও ফুটে, কোকিলও গান গায়, মধুপও ঝঙ্কার করে; এইখানে সে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। এলোচুল করিয়া অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, গাত্রে ধূলা মাখিয়া প্রেমের যোগিনী সাজিয়া, সরসীর জলে কখনও মুখ দেখিতে লাগিল; কখনও নয়ন-জলে ভাসাইয়া গোপাল পুষ্প চুম্বন করিতে লাগিল; কখনও অঞ্চল পাতিয়া তরুতলে শয়ন করিয়া হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল; আহারে রুচি নাই, শয়নে ইচ্ছা নাই, সাজ-সজ্জায় বিষম বিরাগ, গল্প-গুজবে রীতিমত বিরক্তি—অনুপমা দিন দিন শুকাইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া অনুর জননী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন—এক বই মেয়ে নয়, তার আবার এ কি হ'ল? জিজ্ঞাসা করিলে সে কি যে বলে, কেহ বুঝিতে পারে না; ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই মিলাইয়া যায়! অনুর জননী আর এক দিবস জগবন্ধুবাবুকে বলিলেন, ওগো, একবার কি চেয়ে দেখবে না? তোমার একটি বই মেয়ে নয়, সে যে বিনি চিকিৎসায় ম'লো যায়। জগবন্ধুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি হ'ল ওর?

তা জানি নে। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, অসুখ-বিসুখ কিছু নাই।

তবে এমন হ'য়ে যায় কেন? জগবন্ধুবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তা কেমন ক'রে জান্‌ব?

তবে মেয়ে আমার ম'রে যাক্‌?

এ ত বড় মুস্কিলের কথা; জ্বর নেই, বালাই নেই, শুধু শুধু যদি ম'রে যায় ত আমি কি ক'রে ধরে রাখ্‌ব? গৃহিণী শুষ্কমুখে বড়বধূমাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বৌমা, অনু আমার এমন ক'রে বেড়ায় কেন?

কেমন ক'রে জান্‌ব মা?

তোমাদের কাছে কি কিছু বলে না?

কিছু না। গৃহিণী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন—তবে কি হবে? না খেয়ে না শুয়ে এমন ক'রে সমস্ত দিন বাগানে ঘুরে বেড়ালে কদিন আর বাঁচবে? তোরা বাছা যা হ'ক একটা বিহিত ক'রে দে—না হ'লে বাগানের পুকুরে একদিন ডুবে মর্‌ব। বড়বৌ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, দেখে শুনে একটা বিয়ে দাও; সংসারের ভার পড়্‌লে আপনি সব সেরে যাবে।

বেশ কথা, তবে আজিই এ কথা আমি কর্ত্তাকে জানাব।

কর্ত্তা এ কথা শুনিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন, কলিকাল! দাও—বিয়ে দিয়েই দেখ, যদি ভাল হয়। পরদিন ঘটক আসিল। অনুপমা বড়লোকের মেয়ে, তাহাতে রূপবতী, পাত্রের জন্য ভাবিতে হইল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটকঠাকুর পাত্র স্থির করিয়া জগবন্ধুবাবুকে সংবাদ দিলেন। কর্ত্তা এ কথা গৃহিণীকে জানাইলেন; গৃহিণী বড়বৌকে জানাইলেন; ক্রমে অনুপমাও শুনিল।

দুই-এক দিন পরে, একদিন দ্বিপ্রহরের সময় সকলে মিলিয়া অনুপমার

বিবাহের গল্প করিতেছিল, এমন সময়ে সে এলোচুলে, আলু-থালু-বসনে একটা শুষ্ক গোলাপ ফুল হাতে করিয়া ছবিটির মত আসিয়া দাঁড়াইল। অনুর জননী কন্যাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা যেন আমার যোগিনী সেজেছে! বড়বৌঠাকুরুণও একটু হাসিয়া বলিল, বিয়ে হ'লে কোথায় সব চ'লে যাবে। দুটো একটা ছেলে-মেয়ে হ'লে ত কথাই নেই। অনুপমা চিত্রার্পিতার ন্যায় সকল কথা শুনিতে লাগিল। বৌ আবার বলিল, মা, ঠাকুরঝির বিয়ের দিন কবে ঠিক হ'ল?

দিন এখনো কিছু ঠিক করা হয় নি।

ঠাকুরজামাই কি পড়েন?

এইবার বি-এ দেবেন।

তবে ত বেশ ভাল বর। তাহার পর একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, দেখ্‌তে কিন্তু খুব ভাল না হ'লে ঠাকুরঝির আমার পছন্দ হবে না।

কেন পছন্দ হবে না? জামাই আমার বেশ দেখতে। এইবার অনুপমা একটু গ্রীবা বক্র করিল; ঈষৎ হেলিয়া পদনখ দিয়া মৃত্তিকা খনন করিবার মত করিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল, বিবাহ আমি করব না। জননী ভাল শুনিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মা? বড়বৌ অনুপমার কথা শুনিতে পাইয়াছিল। খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ঠাকুরঝি বল্‌ছে, ও কখনও বিয়ে করবে না।

বিয়ে কর্‌বে না?

না।

না করুক্ গে! অনুর জননী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী চলিয়া যাইলে বড়বধূ বলিল, তুই বিয়ে কর্‌বি নে?

অনুপমা পূর্ব্বমত গম্ভীরমুখে বলিল, কিছুতেই না।

কেন?

যাকে তাকে গছিয়ে দেওয়ার নামই বিবাহ নয়! মনের মিল না হ'লে বিবাহ করাই ভুল। বড়বৌ বিস্মিত হইয়া অনুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, গছিয়ে দেওয়া আবার কি লো? গছিয়ে দেবে না ত কি মেয়েমানুষে দেখে শুনে পছন্দ ক'রে বিয়ে করবে?

নিশ্চয়!

তবে তোর মতে আমার বিয়েটাও ভুল হয়ে গেছে? বিয়ের আগে ত তোর দাদার নাম পর্য্যন্ত আমি শুনিনি।

সবাই কি তোমার মত?

বৌ আর একবার হাসিয়া বলিল, তোর কি তবে মনের মানুষ কেউ জুটেছে নাকি? অনুপমা বধূঠাকুরাণীর সহাস্য বিদ্রূপে মুখখানি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ গম্ভীর করিয়া বলিল, বৌ, ঠাট্টা করছ নাকি? এখন কি বিদ্রূপের সময়?

কেন লো—হয়েছে কি?

হয়েছে কি? তবে শোন—অনুপমার মনে হইল, তাহার সম্মুখে তাহার স্বামীকে বধ করা হইতেছে—সহসা কতলু খাঁর দুর্গে বধমঞ্চ সম্মুখে বিমলা ও বীরেন্দ্র সিংহের দৃশ্য তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল; অনুপমা ভাবিল, তাহারা যাহা পারে, সে কি তাহা পারে না? সতী স্ত্রী জগতে কাহাকে ভয় করে? দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু অনৈসর্গিক প্রভায় ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে অঞ্চলখানা কোমরে জড়াইয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া বড়বধূ তিন হাত পিছাইয়া গেল। নিমেষে অনুপমা পার্শ্ববর্ত্তী খাটের খুরো বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া উর্দ্ধনেত্রে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, প্রভু, স্বামী, প্রাণনাথ, জগৎসমীপে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব, তুমিই আমার প্রাণনাথ, প্রভু, তুমি আমার, আমি তোমার! এ খাটের খুরো নয়, এ তোমার পদযুগল—

আমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি, এখনও তোমার চরণ স্পর্শ ক'রে বলছি—এ জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না; কার সাধ্য প্রাণ থাকতে আমাদিকে বিচ্ছিন্ন করে! মা গো, জগৎজননী—

বড়বধূ চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল—ও গো দেখসে, ঠাকুরঝি কেমন ধারা কচ্ছে! দেখিতে দেখিতে গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। বৌঠাকুরুণের চীৎকার বাহির পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল—কি হয়েছে—হ'ল কি? কর্ত্তা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবাবু ছুটিয়া আসিলেন। কর্ত্তা-গিন্নিতে, পুত্র-পুত্রবধূতে, দাস-দাসীতে মুহূর্ত্তে ঘরে ভিড় হইয়া গেল। অনুপমা মূর্চ্ছিত হইয়া খাটের কাছে পড়িয়া আছে! গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন, অনুর আমার কী হ'লো? ডাক্তার ডাক্! জল আন্। বাতাস কর্! ইত্যাদি চীৎকারে, পাড়ার অর্দ্ধেক প্রতিবাসী বাড়ীতে জমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অনুপমা ধীরে ধীরে বলিল, আমি কোথায়? তাহার জননী মুখের নিকট মুখ আনিয়া সস্নেহে বলিলেন, কেন মা, তুমি যে আমার কোলে শুয়ে আছ। অনুপমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু মৃদু কহিল, ওঃ তোমার কোলে! ভাবছিলাম আমি আর কোথাও কোন স্বপ্নরাজ্যে তাঁর সঙ্গে ভেসে যাচ্ছি। দরবিগলিত অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। জননী তাহা মুছাইয়া কাতর হইয়া বলিলেন, কেন কাঁদছ মা? কার কথা বল্‌ছ?

অনুপমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইয়া রহিল। বড়বধূ চন্দ্রবাবুকে একপাশে ডাকিয়া বলিল, সবাইকে যেতে বল, আর কোনও ভয় নেই; ঠাকুরঝি ভাল হয়েছে। ক্রমশঃ সকলে প্রস্থান করিলে রাত্রে বড়বৌ অনুপমার কাছে বসিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, কার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুই সুখী

হ'স্‌? অনুপমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল, সুখ-দুঃখ আমার কিছুই নেই; সেই আমার স্বামী—

তা ত বুঝি—কিন্তু কে সে?

সুরেশ! সুরেশই আমার—

সুরেশ? রাখাল মজুমদারের ছেলে?

হাঁ সে-ই!

রাত্রেই গৃহিণী এ কথা শুনিলেন। পরদিন অমনই মজুমদারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর সুরেশের জননীকে বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও। সুরেশের জননী হাসিয়া বলিলেন, মন্দ কি!

ভাল-মন্দর কথা নয়, দিতেই হবে।

তবে সুরেশকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি। সে বাড়ীতেই আছে; তার মত হ'লে কর্ত্তার অমত হবে না। সুরেশ বাড়ী থাকিয়া তখন বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—এক মুহূর্ত্ত তাহার একবৎসর। তাহার মা বিবাহের কথা বলিলে, সে কানেই তুলিল না। গৃহিণী আবার বলিলেন, সুরো, তোকে বিয়ে কর্‌তে হবে। সুরেশ মুখ তুলিয়া বলিল, তা ত হবেই, কিন্তু এখন কেন? পড়ার সময় ও সব কথা ভাল লাগে না। গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না না—পড়ার সময় কেন? একজামিন হ'য়ে গেলে বিয়ে হবে।

কোথায়?

এই গাঁয়ে জগবন্ধুবাবুর মেয়ের সঙ্গে।

কি? চন্দ্রর বোনের সঙ্গে? যেটাকে খুকী ব'লে ডাকৃত?

খুকী বলে ডাকৃবে কেন—তার নাম অনুপমা। সুরেশ অল্প হাসিয়া বলিল, হাঁ অনুপমা! দূর তা—দূর—সেটা ভারি কুৎসিত।

কুচ্ছিত হবে কেন ? সে বেশ দেখতে।

তা হোক বেশ দেখতে ; এক জায়গায় শ্বশুরবাড়ী, বাপেরবাড়ী আমার ভাল লাগে না।

কেন, তাতে আর দোষ কি ?

দোষের কথায় কাজ নেই, তুমি এখন যাও মা, আমি একটু পড়ি ; কিছুই এখনো হয় নি। সুরেশের জননী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সুরো ত এক গাঁয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না।

কেন ?

তা ত জানি নে। অনুর জননী মজুমদার গৃহিণীর হাত ধরিয়া কাতর ভাবে বলিলেন, তা হবে না ভাই ! এ বিয়ে তোমাকে দিতে হবে।

ছেলের অমত, আমি কি কর্‌ব বল ?

না হ'লে আমি কিছুতেই ছাড়্‌ব না।

তবে আজ থাক ; কাল আর একবার বুঝিয়ে দেখব—যদি মত কর্‌তে পারি।

অনুর জননী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জগবন্ধুবাবুকে বলিলেন, ওদের সুরেশের সঙ্গে যাতে অনুর আমার বিয়ে হয়, তা কর !

কেন বল দেখি ? রায়গ্রামে ত একরকম সব ঠিক হয়েছে। সে সম্বন্ধ আবার ভেঙ্গে কি হবে ?

কারণ আছে।

কি কারণ ?

কারণ কিছু নয় ; কিন্তু সুরেশের মত অমন রূপে-গুণে ছেলে কি পাওয়া যাবে ? আরও, আমার একটি মেয়ে, তার দূরে বিয়ে দেব না। সুরেশের সঙ্গে হ'লে যখন খুসী দেখতে পাব।

আচ্ছা চেষ্টা কর্‌ব।

চেষ্টা নয়—নিশ্চিত দিতে হবে। কর্ত্তা নথ নাড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

তাই হবে গো।

সন্ধ্যার পর কর্ত্তা মজুমদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, বিয়ে হবে না।

সে কি কথা!

কি কর্‌ব বল? ওরা না দিলে ত আমি জোর ক'রে ওদের বাড়ীতে মেয়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারি নে।—দেবে না কেন?

এক গাঁয়ে হয়—ওদের মত নয়। গৃহিণী কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, আমার কপালের দোষ! পরদিন তিনি পুনরায় সুরেশের জননীর নিকট আসিয়া বলিলেন, দিদি, বিয়ে দে!

আমার ত ইচ্ছা আছে, কিন্তু ছেলের মত হয় কৈ?

আমি লুকিয়ে সুরেশকে আরো পাচ হাজার টাকা দেব।

টাকার লোভ বড় লোভ। সুরেশের জননী এ কথা সুরেশের পিতাকে জানাইলেন। কর্ত্তা সুরেশকে ডাকিয়া বলিলেন, সুরেশ, তোমাকে এ বিবাহ করতেই হবে।

কেন?

কেন আবার কি? এ বিবাহে তোমার গর্ভধারিণীর মত, আমারও মত; সঙ্গে সঙ্গে একটু কারণও হয়ে পড়েছে। সুরেশ নতমুখে বলিল, এখন পড়াশুনার সময়—পরীক্ষার ক্ষতি হ'বে!

তা আমি জানি বাপু, পড়াশুনার ক্ষতি করতে তোমাকে বলছি না। পরীক্ষা শেষ হ'লে বিবাহ ক'রো।

যে আজ্ঞে।

অন্নুর জননীর আনন্দের সীমা নাই; এ কথা তিনি কর্ত্তাকে বলিলেন

দাসদাসী সকলকেই মনের আনন্দে এ কথা জানাইয়া দিলেন। বড়বৌ অনুপমাকে ডাকিয়া বলিল, ওলো! বর যে ধরা দিয়েছে।

অনু সলজ্জে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা আমি জানতাম।

কেমন ক'রে জান্‌লি? চিঠিপত্র চল্‌ত নাকি?

প্রেম অন্তর্যামী! আমাদের চিঠিপত্র অন্তরে চল্‌ত।

ধন্যি মেয়ে তুই!

অনুপমা চলিয়া যাইলে বড়বধূঠাকুরাণী মৃদু মৃদু বলিল, পাকামি শুন্‌লে গা জ্বালা করে! আমি তিন ছেলের মা—উনি আজ আমাকে প্রেম শিখাতে এলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভালবাসার ফল

দুর্ল্লভ বসু বিস্তর অর্থ রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার বিংশতিবর্ষীয় একমাত্র পুত্র ললিতমোহন শ্রাদ্ধশান্তি সমাপ্ত করিয়া একদিন স্কুলে যাইয়া মাষ্টারকে বলিল, মাষ্টারমশায়, আমার নামটা কেটে দিন ?

কেন বাপু ?

মিথ্যা পড়ে শুনে কি হবে ? যে জন্য পড়াশুনা তা আমার বিস্তর আছে। বাবা আমার জন্য অনেক পড়ে রেখে গিয়েছেন।

মাষ্টার চক্ষু টিপিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, তবে আর ভাবনা কি ? এইবার চরে খাওগে। এইখানেই ললিতমোহনের বিদ্যাভ্যাস ইতি হইল !

ললিতমোহনের কাঁচা বয়স, তাহাতে বিস্তর অর্থ, কাজেই স্কুল ছাড়িবামাত্র বিস্তর বন্ধুও জুটিয়া গেল। ক্রমে তামাক, সিদ্ধি, গাঁজা, মদ, গায়ক গায়িকা ইত্যাদি একটির পর একটি করিয়া ললিতমোহনের বৈঠকখানা পূর্ণ করিল। এদিকে পিতৃসঞ্চিত অর্থরাশিও জলবৎ ঢেউ খেলিয়া তর তর করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তাহার জননী কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক বুঝাইলেন, অনেক বলিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। এক দিন ঘূর্ণিতলোচনে মাতৃসন্নিধানে আসিয়া বলিল, মা, এখনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দাও। মা বলিলেন, একটি পয়সাও আমার নেই। ললিতমোহন দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া একটা কুড়ুল লইয়া জননীর হাতবাক্স চিরিয়া ফেলিয়া পঞ্চাশ টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। তিনি দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

পরদিন পুত্রের হস্তে লোহার সিন্দুকের চাবি দিয়া বলিলেন, বাবা, এই লোহার সিন্দুকের চাবি নাও; তোমার বাপের টাকা যেমন ইচ্ছা খরচ

ক'রো আর আমি বাধা দিতে আস্‌বো না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি গেলে তোমার চোখ ফোটে।

ললিত বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় যাবে?

তা জানি নে। আত্মঘাতী হ'লে কোথায় যেতে হয়, তা কেউ জানে না; তবে শুনেছি, সদ্গতি হয় না। তা কি কর্‌ব বল, আমার যেমন কপাল!

আত্মঘাতী হবে?

না হ'লে আর উপায় কি? তোমাকে পেটে ধ'রে আমার সব সুখই হ'ল। এখন নিত্যি নিত্যি তোমার লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে যমদূতের আগুন-কুণ্ড ভাল।

ললিতমোহন জননীকে চিনিত; সে বিলক্ষণ জানিত যে, তাহার জননী মিথ্যা ভয় দেখাইবার লোক নহেন; তখন কাঁদিয়া ভূমে লুটাইয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা, তুমি আমাকে মাপ কর, এমন কাজ আর কখন কর্‌ব না। তুমি থাক, তুমি যেও না।

জননী রুক্ষভাবে বলিলেন, তাও কি হয়? তোমার বন্ধু-বান্ধব—তারা সব যাবে কোথায়?

আমি কাউকে চাই নে। আমি টাকা-কড়ি বন্ধু-বান্ধব কিছুই চাইনে, শুধু তুমি থাক।

তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

কেন মা, আমি তোমার মন্দ সন্তান, তা বলে অবিশ্বাসের কাজ কি কখনও করেছি? তুমি এখন থেকে ইচ্ছা-সুখে যা দেবে, তার অধিক এক পয়সাও চাব না।

ইচ্ছা-সুখে তোমাকে এক পয়সাও দিতে ইচ্ছা হয় না—কেন না, এই এক বৎসর দেড় বৎসরের মধ্যে তুমি যত টাকা উড়িয়েছ, তার অর্দ্ধেকও কখনও তোমার জীবনে উপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌বে না।

তুমি আমাকে কিছুই দিও না।

জননী কোমল হইলেন—না, অতটা তোমার সবে না; আমিও তা ইচ্ছে করি নে। মাসে এক শ টাকা পেলে তোমার চলবে কি?

স্বচ্ছন্দে!

তবে তাই হোক্।

দুই-এক দিনের মধ্যেই তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। ললিতমোহন দুই-একজনের বাটীতে ডাকিতে গেল; কেহ বলিল, কাল যাব। কেহ বলিল, আজ কাজ আছে। ফলতঃ কেহই আর আসিল না। এখন সে সম্পূর্ণ একা। একা মদ খায়, একা ঘুরিয়া বেড়ায়। একবার মনে করিল, আর মদ খাইবে না; কিন্তু সময় কিরূপে কাটিবে? কাজেই মদ ছাড়া হইল না! একটা পথে সে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইত; এ পথটা জগবন্ধুবাবুর বাগানের পার্শ্ব দিয়া—অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বলিয়া মদ খাইয়া এখানেই বেড়াইবার অধিক সুবিধা হইত। মাতাল বলিয়া তাহার গ্রামময় অখ্যাতি; কাহারও বাটীতে যাওয়া তাহার ভাল দেখায় না—কাজেই মদ খাইয়া নিজের সঙ্গে নিজে বেড়াইয়া বেড়াইত। আজকাল তাহার আর একজন সঙ্গী জুটিয়াছে—সে অনুপমা! আসিতে যাইতে সে প্রায়ই দেখে, তাহারই মত অনুপমাও বাগানের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়! অনুপমাকে সে বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজকাল তাহাতে যেন একটু নূতনত্ব দেখিতে পায়! জগবন্ধুবাবুর বাগানের প্রাচীরের এক অংশ ভগ্ন ছিল, সেইখানে একটা গাছের পাশে দাঁড়াইয়া দেখে, অনুপমা উদ্যানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা তরুতলে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, কখনও বা ফুল তুলিতেছে, এক-এক সময় বা সরসীর জলে পদদ্বয় ডুবাইয়া বালিকা-সুলভ ক্রীড়া করিতেছে। দেখিতে তাহার বেশ লাগে; ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত চুলগুলি, অযত্নরক্ষিত দেহলতা,

আলু-থালু বসন ভূষণ ও সকলের উপর মুখখানি তাহার মদের চোখে একটী পদ্মফুলের মত বোধ হইত ! মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, জগতে সে অনুপমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। রাত্রি হইলে বাড়ীতে গিয়া শয়ন করে, যতক্ষণ নিদ্রা না হয়, ততক্ষণ অনুপমার মুখই মনে পড়ে, স্বপ্নেও কখনও কখনও তাহার অনিন্দ্যসুন্দর বদনমণ্ডল হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এমনই করিয়া কতদিন যায় ; জগবন্ধুবাবুর উদ্যানের সেই ভগ্ন অংশটীতে বৈকাল হইতে বসিয়া থাকা আজ কাল তাহার নিত্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বালক নহে, অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল যে, অনুপমাকে বাস্তবিকই অতিশয় অধিক রকম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এরূপ ভালবাসায় লাভ নাই—সে জানিত, সে মাতাল ; সে অপদার্থ মূর্খ ; সে সকলের ঘৃণিত জীব—অনুপমার কিছুতেই যোগ্য পাত্র নহে—শত চেষ্টাতেও তাহাকে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে আর এমন করিয়া মন খারাপ করিয়া লাভ কি ? কাল হইতে আর আসিবে না। কিন্তু থাকিতে পারিত না—সূর্য্য অস্তগত হইলে সে মদটুকু খাইয়া সেই ভাঙ্গা পাঁচীলটির উপর আসিয়া বসিত। তবে ভিতরে একটা কথা আছে—কাহাকেও ভালবাসিলে মনে হয়, সেও বুঝি আমাকে ভালবাসে ; আমাকে কেন বাসিবে না ? অবশ্য এ কথা প্রতিপন্ন করা যায় না।

* * * *

একদিন ললিতমোহন প্রাচীরে উঠিয়াছে। এমন সময় চন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল।

চন্দ্রবাবু দ্বারবানকে হাঁকিয়া বলিলেন, —কো পাকড়ো। দ্বারবান প্রথমে বুঝিতে পারিল না ; কাহাকে ধরিতে হইবে ; পরে যখন বুঝিল, ললিতবাবুকে, তখন সেলাম করিয়া তিনহাত পিছাইয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রবাবু পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিলেন, —কো পাকড়কে থানামে দেও।

দ্বারবান আধা বাঙ্গালা আধা হিন্দীতে বলিল, হামি নেহি পারবে বাবু। ললিতমোহন ততক্ষণে ধীরে ধীরে প্রাচীর টপকাইয়া প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে চন্দ্রবাবু বলিলেন, কাহে নেহি পাকড়া? দ্বারবান চুপ করিয়া রহিল। একজন মালী ললিতকে বিলক্ষণ চিনিত, সে বলিল, ও বেটা ভোজপুরীর সাধ্য কি, ললিতবাবুকে ধরে? ওর মত চারটে দরওয়ানের মাথা ওর এক ঘুসিতে ভেঙ্গে যায়। দ্বারবানও তাহা অস্বীকার করিল না, বলিল, বাবু নোকরি করনে আয়া, না জান্ দেনে আয়া?

চন্দ্রবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন! তিনি ললিতের উপর পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ চটা ছিলেন, এখন সময় পাইয়া, সাক্ষী জুটাইয়া অনধিকার প্রবেশ এবং আরও কত কি অপরাধে আদালতে নালিশ করিলেন। জগবন্ধু-বাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই এ মকদ্দমা করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু চন্দ্রনাথ কিছুতেই শুনিলেন না। বিশেষ মর্ম্মপীড়িতা অনুপমা জিদ করিয়া বলিল যে, পাপীকে শাস্তি না দিলে তাহার মন কিছুতেই সুস্থির হইবে না।

ইন্‌স্পেক্টর বাটীতে আসিয়া অনুপমার এজাহার লইল। অনুপমা সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্ বলিল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে ললিতের জননী বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াও পুত্রকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলেন না। তিন বৎসর ললিত-মোহনের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার একেবারে প্রথম হইয়াছেন। গ্রামময় সুখ্যাতির একটা রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। অনুপমার জননীর আনন্দের সীমা নাই। আনন্দে, সুরেশের জননীকে গিয়া বলিলেন, নিজের কথা নিজে বলতে নেই, কিন্তু দেখ দেখি একবার আমার মেয়ের পয়!

সুরেশের মা সহাস্যে বলিলেন, তা ত দেখছি।

একবার বিয়ে হোক, তার পর দেখিস্—তোর ছেলে রাজা হবে। অনু যখন জন্মায়, তখন একজন গণৎকার এসে গুণে বলেছিল যে এ মেয়ে রাণী হবে। অত সুখে কেউ কখনও থাকে নি, থাকবে না; যত সুখ তোমার মেয়ের হবে।

কে বলেছিল?

একজন সন্ন্যাসী!

কিন্তু তুমি তোমার জামাইকে একখানা বাড়ী কিনে দিও।

তা দেব না? চন্দ্রকে আমি পেটের ছেলেই জানি, কিন্তু অনুরও ত কর্ত্তার অর্দ্ধেক বিষয় পাওয়া উচিত, আমি বেঁচে থাক্‌লে তা পাবেও।

তাই হোক, ওরা রাজা-রাণী হয়ে সুখে থাক্—আমরা যেন দেখি মরি।

দুইদিন পরে রাখাল মজুমদার পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, এই বৈশাখে তোমার বিবাহের দিন স্থির করলাম।

এখন বিবাহ হয়, আমার একেবারে ইচ্ছা নয়।

কেন?

আমি Gilchrist Scholarship পেয়েছি, তাতে আমি ইচ্ছা করলে বিলাতে গিয়ে পড়তে পারি।

তুমি বিলাত যাবে?

ইচ্ছা আছে।

পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। অমন কথা আর মুখে এনো না।

, বিনা পয়সায় যখন এ সুবিধা পেয়েছি, তখন দোষ কি? রাখালবাবু কথায় একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন—নাস্তিক বেটা! দোষ কি? পরের পয়সায় যদি বিষ পাওয়া যায় ত কি খেতে হবে?

সে-কথায় এ-কথায় অনেক প্রভেদ।

প্রভেদ আর কোথায়? এক দিকে জাত খোওয়ান, ম্লেচ্ছ হওয়া, আর অপর দিকে বিষ-ভোজন, ঠিক এক নয় কি? চুল চুল মিলে গেল না কি?

সুরেশ আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া নিরুত্তরে প্রস্থান করিল। সে চলিয়া যাইলে রাখালবাবু আপনা-আপনি হাসিয়া বলিলেন, বেটা পাতা তুই ইংরিজি প'ড়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক করতে আসে! কেমন কথাটা বল্‌লাম—পরের পয়সায় বিষ পেলে কি খেতে হবে? বাছাধন আর দ্বিতীয় কথাটি বল্‌তে পার্‌লে না। এ অকাট্য যুক্তি কি ও কাট্‌তে পারে!

বিবাহের সমস্ত পাকা রকম স্থির হইয়া যাইলে বড়বধূ একদিন অনুপমাকে বলিলেন, কি লো! বরের সুখ্যাতি যে গ্রামে ধরে না।

অনুপমা মৃদু হাসিয়া বলিল, যার সতীসাধ্বী স্ত্রী; জগতে তার সকল সুখের পথই উন্মুক্ত থাকে।

তবু ত এখনো বিয়ে হয়নি লো!

বিবাহ আমাদের অনেক দিন হয়েছে; জগৎ জানে না বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বহুদিন আমাদের পূর্ণ মিলন হয়ে গিয়েছে।

বড়বধূ অল্প হাসিল; ওষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া একটু থামিয়া বলিল, এ কথা আর কোথাও বলিস্ নে; আমরা বুড়ো মাগী, আমাদের ত বলা দূরে থাক্—এমন ধারা শুন্‌লেও লজ্জা করে; সব কথায় তুই যেন থিয়েটারে অ্যাক্ট কর্ত্তে থাকিস্। এমন করলে লোকে পাগল বল্‌বে যে!

আমি প্রেমে পাগল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ

আজ ৫ই বৈশাখ। অনুপমার বিবাহ-উৎসবে আজ গ্রামটা তোলপাড় হইতেছে। জগবন্ধুবাবুর বাটীতে আজ ভিড় ধরে না। কত লোক যাইতেছে, কত লোক হাঁকাহাঁকি করিতেছে। কত খাওয়ান দাওয়ানর ঘটা, কত বাজনা বাদ্যের ধূম। যত সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল, ধূমধাম তত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; সন্ধ্যা-লগ্নেই বিবাহ; এখনই বর আসিবে—সকলেই উৎসাহে আগ্রহে উন্মুখ হইয়া আছে। কিন্তু বর কোথায়? রাখালবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই কলবর বাধিয়া উঠিয়াছে, সুরেশ গেল কোথায়? এখানে খোঁজ, ওখানে খোজ, এদিকে দেখ, ওদিকে দেখ। কিন্তু কেহই সুরেশকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না। কুসংবাদ পঁহুছিতে বিলম্ব হয় না, বজ্রাগ্নির মত এ কথা জগবন্ধুবাবুর বাটীতে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। বাড়ী-শুদ্ধ লোক সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; সে কি কথা!

আটটার সময় বিবাহের লগ্ন, কিন্তু নয়টা বাজিতে চলিল; কোথাও বরের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জগবন্ধুবাবু মাথা চাপড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। গৃহিণী কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার নিকটে পড়িলেন, কি হবে গো? কর্ত্তার তখন অর্দ্ধক্ষিপ্তাবস্থা। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, হবে আমার শ্রাদ্ধ—আর কি হবে? এই হতভাগা মেয়ের জন্য বৃদ্ধ-বয়সে আমার মান গেল, যশ গেল, জাতি গেল; এখন একঘরে হয়ে থাকতে হবে। কেন মর্‌তে বুড়ো বয়সে তোমাকে আবার বিয়ে করেছিলাম, তোমারই জন্য আজ এই অপমান! শাস্ত্রেই আছে, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী। তোমার কথা শুনে নিজের পায়ে

নিজে কুড়ুল মেরেছি। যাও, তোমার মেয়ে নিয়ে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।

আহা! গৃহিণীর দুঃখের কথা বলিয়া কাজ নাই। এ-দিকে এই আর ও-দিকে আর এক বিপদ্। অনুপমা ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছে।

এ-দিকে রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে—দশটা, এগারোটা, বারোটা করিয়া ক্রমশঃ একটা দুইটা বাজিয়া গেল; কিন্তু কোথাও সুরেশের সন্ধান হইল না।

সুরেশকে পাওয়া যাক্ আর না যাক্, অনুপমার বিবাহ কিন্তু দিতেই হইবে! কেন না আজ রাত্রে বিবাহ না হইলে জগবন্ধুবাবুর জাতি যাইবে।

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় পঞ্চাশদ্বর্ষীয় কাসরোগী রামদুলাল দত্তকে পাড়ার পাঁচ জন—জগবন্ধুবাবুর হিতৈষী বন্ধু, বরবেশে খাড়া করিয়া লইয়া আসিল।

অনুপমা যখন শুনিল, এমনি করিয়া তাহার মাথা খাইবার উদ্যোগ হইতেছে, তখন মূর্চ্ছা ছাড়িয়া দিয়া জননীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল—ও মা! আমায় রক্ষা কর, এমন ক'রে আমার গলায় ছুরি দিও না। এ বিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হব। মা কাঁদিয়া বলিলেন, আমি কি করব মা। মুখে যাহাই বলুন না, কন্যার দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল, তাই কাঁদিয়া কাটিয়া আবার স্বামীর কাছে আসিলেন—ওগো, একবার শেষটা ভেবে দেখ, এ বিয়ে দিলে মেয়ে আমার বিষ খাবে। কর্ত্তা কোন কথা না কহিয়া একেবারে অনুপমার নিকটে আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, ওঠো ভোর হয়ে যায়।

কোথায় যাব বাবা!

এখনই সম্প্রদান করব।

অনুপমা কাঁদিয়া ফেলিল—বাবা, আমাকে মেরে ফেল, আমি বিষ খাব।

যা ইচ্ছে হয় কাল খেয়ো মা, আজ বিয়ে দিয়ে আমার জাত বাঁচাই, তার পর যেমন খুশী ক'রো, বিষ খেও, জলে ডুবে মরো, আমি একবারও বারণ করব না। কি নিদারুণ কথা! এইবার যথার্থ-ই অনুপমার ভিতর পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল—বাবা! আমায় রক্ষা কর। কত কাতরোক্তি কত ক্রন্দন, কিন্তু কোন কথাই খাটিল না। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ জগবন্ধুবাবু সেই রাত্রেই বৃদ্ধ রামদুলাল দত্তের হস্তে অনুপমাকে সম্প্রদান করিলেন।

বহুকাল বিপত্নীক বৃদ্ধ রামদুলালের আপনার বলিতে সংসারে আর কেহ নাই। দুইখানি পুরাতন ইষ্টকনির্ম্মিত ঘর, একটু শাক-সব্জীর বাগান—ইহাই দত্তজীর সাংসারিক সম্পত্তি। বহু ক্লেশে তাঁহার দিন গুজরান হয়। বিবাহ করিয়া পরদিন অনুপমাকে বাড়ী আনিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনেক খাদ্যদ্রব্য আসিল; অনেক দাস-দাসী আসিল—কোনও ক্লেশ নাই, ছয়-সাত দিন তাঁহার পরম সুখে অতিবাহিত হইল। বড়লোক শ্বশুর—আর তাঁহার কোনও ভাবনা নাই; বিবাহ করিয়া কপাল ফিরিয়াছে। কিন্তু অনুপমার স্বতন্ত্র কথা; আর দিন-দুই থাকিয়া সে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া দাস-দাসীরাও গোপনে চক্ষু মুছিল।

বাড়ী গিয়া প্রাণত্যাগ করিব, এ পরামর্শ অনুপমা স্বামি-ভবন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার তাহার যথার্থ মরিবার বাসনা হইয়াছে। অনেক রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে সে নিঃশব্দে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া বাগানের পুষ্করিণীর সোপানে আসিয়া বসিল। আজ তাহাকে মরিতে হইবে, মুখের মরা নয়, কাজের মরা মরিতে হইবে। অনুপমার মনে পড়িল, আর একদিন সে এইখানে মরিতে গিয়াছিল, সেও অধিক দিন নয়, কিন্তু তখন মরিতে পারে নাই; কেন না একজন ধরিয়া ফেলিয়াছিল। আজ সে কোথায়? জেলখানায় কয়েদ খাটিতেছে। কোন অপরাধে?

শুধু বলিতে আসিয়াছিল যে, সে তাহাকে ভালবাসে। কে জেলে দিল? চন্দ্রবাবু। কেন? তাহাকে দেখিতে পারিত না বলিয়া, সে মাতাল বলিয়া, সে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু অনুপমা কি বাঁচাইতে পারিত না? পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই; বরং জেলে দিতে সহায়তাই করিয়াছে। আজ তাহার মনে হইল, ললিত কি যথার্থ-ই ভালবাসিত? হয়ত বাসিত, হয়ত বাসিত না; না বাসুক, কিন্তু তাহাকে দণ্ডিত করিয়া তাহার কি ইষ্ট-সিদ্ধি হইয়াছে? জেলে পাথর ভাঙ্গিতেছে, ঘানি টানিতেছে আরও কত কি নীচ কর্ম্ম করিতে হইতেছে; ইহাতে হয়ত চন্দ্রবাবুর লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহার কি? সে দণ্ডিত না হইলে কি তাহাকে পাইতে পারিত? যিনি এখন মনের আনন্দে নিজের উন্নতির জন্য জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাইতেছেন? অনুপমা সেইখানে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, তাহার পর জলে নামিল। এক হাঁটু, এক বুক, এক গলা করিয়া, ক্রমশঃ ডুবন-জলে আসিয়া পড়িল। আধ মিনিট কাল জলতলে থাকিয়া অনেক জল খাইয়া সে আবার উপরে ভাসিয়া উঠিল; আবার ডুব দিল, আবার ভাসিয়া উঠিল। সে সাঁতার দিতে জানিত তাই সমস্ত পুষ্করিণীটা তন্ন তন্ন করিয়াও কোথাও ডুবন জল মিলিল না। অনেকবার ডুব দিল, অনেক জলও খাইল, কিন্তু একেবারে ডুবিয়া যাইতে কিছুতেই পারিল না। সে দেখিল, মরিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও ডুব দিয়া, নিশ্বাস আট্‌কাইয়া আসিবার উপক্রম হইলেই নিশ্বাস লইতে উপরে ভাসিয়া উঠিতে হয়! এইরূপে পুষ্করিণীটা সাঁতার কাটিয়া প্রায় নিশাশেষে যখন সে তাহার ক্লান্ত অবসন্ন নির্জ্জীব দেহখানা কোনরূপে টানিয়া আনিয়া সোপানের উপর ফেলিল, দেখিল, যে কোনও অবস্থায় যে কোনও কারণেই হোক এমন করিয়া একটু একটু করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে। পূর্ব্বে সে বিরহ-ব্যথায় জর্জ্জরিত-তনু হইয়া দিনে শত বার

করিয়া মরিতে যাইত, তখন ভাবিত, প্রাণটা রাখা না রাখা নায়ক-নায়িকার একেবারে মুঠার ভিতরে, কিন্তু আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রাণটার সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াও সেটাকে বাহির করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ সে বিলক্ষণ বুঝিল, তাহাকে জন্মের মত বিদায় দেওয়া—তাহার একাদশবর্ষীয় বিরহব্যথায় কুলাইয়া উঠে না।

ভোর-বেলায় যখন সে বাটী আসিল, তখন তাহার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপিতেছে; মা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনু, এত ভোরেই নেয়ে এলি মা? অনু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

এ-দিকে দত্ত মহাশয় একরূপ চিরস্থায়ি-রূপে শ্বশুর-ভবনে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রথম প্রথম জামাই-আদর তাঁহার কতকটা মিলিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাও কম পড়িয়া আসিল। বাড়ী-শুদ্ধ কেহই প্রায় তাঁহাকে দেখিতে পারে না; চন্দ্রনাথবাবু প্রতি কথায় তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অপদস্থ, লাঞ্ছিত করেন; তাহার একটু কারণও হইয়াছিল; একে ত চন্দ্রবাবুর হিংসাপরবশ অন্তঃকরণ, তাহাতে আবার অকর্ম্মণ্য জামাতা বলিয়া জগবন্ধুবাবু কিছু বিষয়-আশয় দিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন। অনুপমা কখনও আসে না; শাশুড়ীঠাকুরাণীও কখনও সে বিষয়ে তত্ত্ব লন না; তথাপি রামদুলালের মনের আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। যত্ন-আত্মীয়তার তিনি বড় একটা ধার ধারিতেন না; যাহা পাইতেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাহার উপর দুবেলা পরিতোষজনক আহার ঘটিতেছে। বৃদ্ধাবস্থায় দত্ত মহাশয় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতেন। কিন্তু তাঁহার সুখভোগ করিবার অধিক দিনও আর বাকি ছিল না। একে জীর্ণ-শীর্ণ শরীর, তাহার উপর পুরাতন সখা কাসরোগ অনেকদিন হইতে তাঁহার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছে। প্রতি বৎসরই শীতকালে তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিত। এবারও শীতকালে

বিষম টানাটানি করিতে লাগিল। জগবন্ধুবাবু দেখিলেন যক্ষ্মা রামদুলালের অস্থি-মজ্জায় প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাড়াগাঁয়ে সুচিকিৎসা হইবে না জানিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কিছুদিন সুচিকিৎসার পর সতী-সাধ্বী অনুপমার কল্যাণে দুটি বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সদানন্দ রামদুলাল সংসার ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৈধব্য

তথাপি অনুপমা একটু কাঁদিল। স্বামী মরিলে বাঙ্গালীর মেয়েকে কাঁদিতে হয়, তাই কাঁদিল। তাহার পর স্ব-ইচ্ছায় শাদা থান পরিয়া সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, অনু, তোর এ বেশ ত আমি চোখে দেখ্‌তে পারি না অন্ততঃ হাতে এক জোড়া বালাও রাখ্‌।

তা হয় না; বিধবার অলঙ্কার পর্‌তে নেই।

কিন্তু তুই কচি মেয়ে!

তাহা হোক, বাঙ্গালীর মেয়ে বিধবা হইলে কচি বুড়ো সমস্ত এক হইয়া যায়। জননী আর কি বলিবেন? শুধু কাঁদিতে লাগিলেন। অনুপমার বৈধব্যে লোকে নূতন করিয়া শোক করিল না। দুই-এক বৎসরেই সে যে বিধবা হইবে তাহা সকলেই জানিত। কেহ বলিল, মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে কি আর সধবা থাকে? কর্ত্তাও এ কথা জানিতেন, গৃহিণীও বুঝিতেন; তাই শোকটা নূতন করিয়া হইল না। যাহা হইবার, তাহা বিবাহরাত্রেই হইয়া গিয়াছে—স্বামীকে ভালবাসিত না, জানিল না

শুনিল না, তথাপি অনুপমা কঠোর বৈধব্য-ব্রত পালন করিতে লাগিল। রাত্রে জলস্পর্শ করে না, দিনে একমুষ্টি স্বহস্তে সিদ্ধ করিয়া লয়, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করে। আজ পূর্ণিমা; কাল অমাবস্যা; পরশু শিবরাত্রি; এমন করিয়া মাসের পনর দিন সে কিছুই খায় না। কেহ কোনও কথা বলিলে বলে, আমার ইহকাল গিয়াছে, এখন পরকালের কাজ করিতে দাও। এত কিন্তু সহিবে কেন? উপবাসে অনিয়মে অনুপমা শুকাইয়া অর্দ্ধেক হইয়া গেল। দেখিয়া দেখিয়া গৃহিণী ভাবিলেন, এইবার সে মরিয়া যাইবে। কর্ত্তাও ভাবিলেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে। তাই একদিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, অনুর আবার বিয়ে দিই। গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তা কি হয়? ধর্ম্ম যাবে যে?

অনেক ভেবে দেখলাম দুবার বিবাহ দিলেই ধর্ম্ম যায় না। বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনও সম্বন্ধ নাই, বরং নিজের কন্যাকে এমন করে খুন করলেই ধর্ম্মহানির সম্ভাবনা।—তবে দাও। অনুপমা কিন্তু এ কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, তা হয় না। কর্ত্তা তখন নিজে অনুকে ডাকিয়া বলিলেন, খুব হয় মা।

তা হ'লে আমার ইহকাল পরকাল—দুই কালই গেল।

কিছুই যায় নাই, যাবে না—বরং না হলেই যাবার সম্ভাবনা। মনে কর, তুমি যদি গুণবান পতি লাভ কর, তা হলে দুই কালেরই কাজ করতে পারবে।

একা কি হয় না?

না মা, হয় না। অন্ততঃ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের দ্বারা হয় না। ধর্ম্ম-কর্ম্মের কথা ছেড়ে দিয়ে সামান্য কোনও একটা কর্ম্ম করতে হলেই তাদিগে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, স্বামী ভিন্ন তেমন সাহায্য আর কে করতে পারে বল? আরও কি দোষে তোমার এত শাস্তি?

অনুপমা আনতমুখে বলিল, আমার পূর্ব্ব-জন্মের ফল! গোঁড়া হিন্দু জগবন্ধুবাবুর কর্ণে এ কথাটা খট্ করিয়া লাগিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তাই যদি হয়, তবুও তোমার একজন অভিভাবকের প্রয়োজন; আমাদের অবর্ত্তমানে কে তোমাকে দেখবে? —দাদা দেখবেন।

ঈশ্বর না করুন, কিন্তু সে যদি না দেখে? সে তোমার মার পেটের ভাই নয়; বিশেষ আমি যতদূর জানি, তার মনও ভাল নয়। অনুপমা মনে মনে বলিল, তখন বিষ খাব। —আরও একটা কথা আছে অনু, পিতা হলেও সে কথা আমার বলা উচিত—মানুষের মন সব সময়ে যে ঠিক এক রকমই থাকবে, তা কেউ বলতে পারে না; বিশেষ যৌবনকালে প্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বদা বশ রাখতে মুনি-ঋষিরাও সমর্থ হন না। কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অনুপমা কহিল, জাত যাবে যে!

না মা, জাত যাবে না—এখন আমার সময় হয়ে আস্‌ছে—চোখও ফুট্‌ছে। অনুপমা ঘাড় নাড়িল। মনে মনে বলিল, তখন জাত গেল, আর এখন যাবে না! যখন চক্ষুকর্ণ বন্ধ করে তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ কথা ভাবলে না কেন? আজ আমারও চক্ষু ফুটেছে—আমিও ভালরূপ প্রতিশোধ দেব।

কোনরূপে তাহাকে টলাইতে না পারিয়া জগবন্ধুবাবু বলিলেন, তবে মা, তাই ভাল; তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিবাহ দিতে চাই না। তোমার খাবার পরবার ক্লেশ না হয়, তা আমি করে যাব। তার পর ধর্ম্মে মন রেখে যাতে সুখী হতে পার, করো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রবাবুর সংসার

তিন বৎসর পরে খালাস হইয়াও ললিতমোহন বাড়ী ফিরিল না। কেহ বলিল, লজ্জায় আসিতেছে না। কেহ বলিল, সে গ্রামে কি আর মুখ দেখাতে পারে? ললিতমোহন নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া দুই বৎসর পরে সহসা একদিন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জননী আনন্দে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—বাবা, এবার বিবাহ করে সংসারী হও, যা কপালে ছিল তা ত ঘটে গিয়েছে, এখন সে জন্য আর মনে দুঃখ ক'রো না। ললিতও যাহা হয় একটা করিবে স্থির করিল।

পাঁচ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া ললিত গ্রামে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল, বিশেষ দেখিল, জগবন্ধুবাবুর বাটীতে। কর্ত্তা গিন্নী কেহ জীবিত নাই। চন্দ্রনাথবাবু এখন সংসারের কর্ত্তা, অনুপমা বিধবা হইয়া এইখানেই আছে; কারণ তাহার অন্যত্র স্থান নাই। পূর্ব্বেই জননীর মৃত্যু হইয়াছিল, পরে পিতার মৃত্যুর পর অনুপমা ভাবিয়াছিল পিতা যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া কোনও তীর্থস্থানে থাকিবে এবং সেই টাকায় পুণ্যধর্ম্ম, নিয়মব্রত করিয়া অবশিষ্ট জীবনটা কাটাইয়া দিবে। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি হইলে উইল দেখিয়া সে একেবারে মর্ম্মাহত হইল, পিতা কেবল তাহার নামে পাঁচ শত টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাহারা বড়লোক; এ সামান্য টাকা তাহাদিগের নিকট টাকাই নহে; বাস্তবিক এই অর্থে কাহারও চিরজীবন গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। গ্রামে অনেকেই কানাঘুষা করিল, এ উইল জগবন্ধুবাবুর নহে, ভিতরে কিছু কারসাজি আছে। কিন্তু সে কথায় ফল কি? নিরুপায় হইয়া অনুপমা চন্দ্রবাবুর বাটীতেই রহিল।

লোকে বলে পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত সৎমাকে চিনিতে পারা যায় না; সৎভাইকেও সেইরূপ পিতার জীবিতকাল পর্য্যন্ত চিনিতে পারা

কঠিন। এতদিন পরে অনুপমা জানিতে পারিল, তাহার দাদা চন্দ্রনাথ-বাবু কি চরিত্রের মানুষ! যত প্রকার অধম শ্রেণী মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় চন্দ্রনাথবাবু তাহাদের সর্ব্বনিকৃষ্ট। হৃদয়ে একতিল দয়া-মায়া নাই, চক্ষে এক বিন্দু চামড়া পর্য্যন্ত নাই। অনুপমার সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় তিনি তাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রতি কথায়, এমন কি উঠিতে বসিতে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করিতেন। অনেক দিন হইতে তিনি অনুপমাকে দেখিতে পারেন না, কিন্তু আজকাল ত অধিক না দেখিতে পারিবার কারণ তিনিই ভাল জানেন। বড়বধূ পূর্ব্বে তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু এখন তিনিও দেখিতে পারেন না। যখন অনু বড়লোকের মেয়ে ছিল, যখন তাহার বাপ মা বাঁচিয়াছিল, যখন তাহার একটা কথায় পাঁচ জন ছুটিয়া আসিত, তখন তিনিও ভালবাসিতেন। এখন সে দুঃখিনী, আপনার বলিতে কেহ নাই, টাকা-কড়ি নাই, পরের অন্ন না খাইলে দিন কাটে না, তাহাকে কে এখন ভালবাসিবে? কে এখন যত্ন করিবে? বড়বধূর তিন-চারিটি ছেলে-মেয়ের ভার অনুর উপর; তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়, স্নান করাইতে হয়, পরাইতে হয়, কাছে করিয়া শুইতে হয়, তথাপি কোনও বিষয়ে একটু ক্রটী হইলেই অমনি বড়বধূঠাকুরাণী রাগ করিয়া রীতিমত পাঁচটা কথা শুনাইয়া দেন। ইহা ভিন্ন অনুপমাকে নিত্য দুবেলা চন্দ্রবাবুর জন্য দুই-চারিটা ভাল তরকারী রাঁধিতে হয়; পাচক ব্রাহ্মণ তেমন প্রস্তুত করিতে পারে না। আর না হইলে চন্দ্রবাবুরও কিছু খাওয়া হয় না। একাদশীই হৌক, দ্বাদশীই হৌক, আর উপবাসই হৌক, সে রান্না তাহাকে রাঁধিতেই হইবে। বিধবা হইয়া অনুপমা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিত; এখন তাহাকে সে সময়টুকুও দেওয়া হয় না। একটু বিলম্ব হইলেই বড়বধূঠাকুরাণী বলিয়া উঠেন, ঠাকুরঝি, একটু হাত চালিয়ে

নাও ; ছেলেরা কাঁদছে—এখন পর্য্যন্ত কিছু খেতে পায় নি। অনুপমা যা তা করিয়া উঠিয়া আসে ; একটি কথাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। একাদশীর দীর্ঘ উপবাস করিয়াও তাহাকে রাত্রে রন্ধন করিতে যাইতে হয় ; তৃষ্ণায় বুক ফাটিতে থাকে, অগ্নির উত্তাপে মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে, গা ঝিম্ ঝিম্ করে, তবু কথা কহে না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সহ্য করিবার ক্ষমতাও হয়। কেন না জগদীশ্বর তাহা শিখাইয়া দেন—না হইলে অনুপমা এতদিন মরিয়া যাইত।

এ সংসারে তাহার অপেক্ষা দাস-দাসীরা শ্রেষ্ঠ ; জোর করিয়া তাহাদের দুটো বলিলে তাহারাও দুটো জোরের কথা বলিতে পারে, অন্ততঃ আমার মাহিনা পত্র চুকাইয়া দিন, বাড়ী যাই—এ কথাও বলিতে পারে ; কিন্তু অনু তাহাও বলিতে পারে না ; সে বিনামূল্যে ক্রীতদাসী ; মারো, কাটো, তাহাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আর কোথাও যাইবার যো নাই, সে বিধবা, সে বড়লোকের কন্যা ! অনুপমার অবস্থা বুঝাইতে পারা যায় না, বুঝিতে হয়, বাঙ্গালীর ঘরে পরান্নপ্রত্যাশিনী বিধবাই কেবল তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন, অন্যে না বুঝিতেই পারে।

আজ দ্বাদশী। সকাল সকাল স্নান করিয়া অনুপমা পূজা করিতে বসিল। তখনও পনের মিনিট হয় নাই ; বড়বধূ ঘরের বাহির হইতেই একটু বড় গলায় বলিলেন, ঠাকুরঝি, তোমার কি আজ সমস্ত দিনে হবে না ? এমন করলে চল্‌বে না বাপু। অনুপমা শিবের মাথায় জল দিতেছিল, কথা কহিল না ; বড়বধূ দশমিনিট পরে পুনর্ব্বার ঘুরিয়া আসিয়া সেইখান হইতেই চীৎকার করিলেন—অত পুণ্যি ছালায় আঁটবে না গো, অত পুণ্যি ক'রো না—আর অত পুণ্যি-ধর্ম্মের সখ থাকে ত বনে জঙ্গলে গিয়ে কর গে, সংসার থেকে অত বাড়াবাড়ি সইতে পারা যায় না। তথাপি অনুপমা কথা কহিল না।

বড়বৌ দ্বিগুণ চেঁচাইয়া উঠিলেন—বলি, কেউ খাবে দাবে—না, না? অনুপমা হস্তস্থিত বিল্বপত্র নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আমার অসুখ হয়েছে, আজ আমি কিছুই পারব না।

পারবে না? তবে সবাই উপোস করুক?

কেন, আমি ছাড়া কি লোক নেই? ঠাকুরের কি হ'ল?

তার জ্বর হয়েছে—আর উনি কি ঠাকুরের রান্না খেতে পারেন?

না পারেন—তুমি রেঁধে দাওগে।

আমি রাঁধব? মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, একটা কবিরাজ চব্বিশ ঘণ্টা আমার পিছনে লেগে আছে—আর আমি আগুনের তাতে যাব?

অনুপমা জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, তবে সবাইকে উপোস করতে বলগে।

তাই যাই—তোমার দাদাকে এ কথা জানাইগে। আর তোমার অসুখ হবে কেন? এই নেয়ে ধুয়ে এলে, এখনি গিলবে কুটবে আর বড় ভাইকে একটু রেঁধে খাওয়াতে পার না?

না পারি নে। বড়বৌ, আমি তোমাদের কেনা বাঁদী নই যে, যা মুখে আসবে, তাই বলবে। আমি এ সব কথা দাদাকে জানাব।

বড়বৌ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, তাই জানাও গে—তোমার দাদা এসে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যাক্!

অনুপমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, তা জানি, দাদা ভাল হ'লে আর তোমার এত সাহস।

কেন, তিনি করেছেন কি? খেতে দিচ্ছেন, পরতে দিচ্ছেন—আবার কি করবেন! সত্যি সত্যি ত আর আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় মাথায় ক'রে রাখতে পারেন না—এ জন্য আর মিছে রাগ করলে চলবে কেন?

সমস্ত বস্তুরই সীমা আছে। অনুপমার সহিষ্ণুতারও সীমা আছে

সে এতদিন যাহা বলে নাই, আজ তাহা বলিয়া ফেলিল; বলিল, দাদা আমাকে খাওয়াবেন পরাবেন কি—যে বাপের টাকায় তিনি খান—আমি সেই বাপের টাকায় খাই। বড়বৌ ক্রুদ্ধ হইল—তাই যদি হ'ত তা হ'লে বাপ আর পথের কাঙাল ক'রে রেখে যেত না।

পথের কাঙ্গাল তিনি ক'রে যান নি, তোমরাই করেছ। গ্রাম-শুদ্ধ সবাই জানে, তিনি আমাকে নিঃসম্বল রেখে যান নি। সে টাকা দাদা চুরি না করলে আজ আমাকে তোমার মুখনাড়া খেতে হ'তো না। বড়বধূর মুখ প্রথমে শুকাইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল—গ্রাম-শুদ্ধ সবাই জানে—উনি চোর? তবে একথা ওঁকে জানাব?

জানিও—আরও ব'লো যে পাপের ফল তাঁকে পেতেই হবে।

সেদিন এমনই গেল। অবশ্য এ কথা চন্দ্রবাবু শুনিতে পাইলেন; কিন্তু কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

চন্দ্রনাথবাবুর সংসারে ভোলা বলিয়া একজন ছোঁড়া মত ভৃত্য ছিল। পাঁচ-ছয় দিন পরে চন্দ্রবাবু একদিন তাহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আনিয়া বেদম প্রহার করিতে লাগিলেন। চীৎকার শব্দে অন্যান্য দাসদাসীরা ছুটিয়া আসিল—তখনও অসম্ভব মার চলিতেছে। অনুপমা ঘরের ভিতর পূজা করিতেছিল, পূজা ফেলিয়া সেও ছুটিয়া আসিল। ভোলার নাক-মুখ দিয়া তখনও রক্ত ছুটিতেছিল। অনুপমা চীৎকার করিয়া উঠিল, দাদা কর কি—ম'রে গেল যে! চন্দ্রবাবু খিঁচাইয়া উঠিলেন—আজ বেটাকে একেবারে মেরে ফেল্‌ব। তোকেও সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেল্‌তাম, কিন্তু শুধু মেয়েমানুষ ব'লে তুই বেঁচে গেলি। আমার সংসারে এত পাপ আমি বরদাস্ত করবো না। বাবা তোকে পাঁচশো টাকা দিয়ে গেছেন—তাই নিয়ে তুই আজই আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যা।

অনুপমা কিছুই বুঝিতে পারিল না শুধু বলিল, সে কি?

কিছুই নয়। আজ টাকা নাও, নিয়ে ভোলার সঙ্গে দূর হ'য়ে যাও। বাইরে গিয়ে যা খুসী কর গে।

অনুপমা সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া গেল। দাস-দাসীরা সকলেই কথা শুনিল। কেহ মুখে কাপড় দিয়া হাসিল, কেহ হাসি চাপিয়া ভাল মানুষের মত সরিয়া গেল; কেহ বা ছুটিয়া অনুপমাকে তুলিতে আসিল। চন্দ্রবাবু মৃতপ্রায় ভোলার মুখে আর একটা পদাঘাত করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শেষ দিন

আজ অনুপমার শেষ দিন। এ সংসারে সে আর থাকিবে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে সুখ পায় নাই। ছেলে-বেলায় ভালবাসিয়াছিল বলিয়া নিজের শান্তি নিজে ঘুচাইয়াছিল; অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছিল বলিয়া বিধাতা তাহাকে একতিলও সুখ দেন নাই। যাহাকে ভালবাসিত মনে করিত, তাহাকে পাইল না; যে ভালবাসিতে আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইয়া দিল। পিতা নাই, মাতা নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই, স্ত্রীলোকের একমাত্র অবলম্বন সতীত্বের সুযশ, তাহাও ঈশ্বর কাড়িয়া লইতে বসিয়াছেন। তাই আর সে সংসারে থাকিবে না। বড় অভিমানে তাহার হৃদয় ফাটিয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ নিদ্রিত কৌমুদী-রজনীতে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া, আবার—বার বার তিনবার—পুষ্করিণীর সেই পুরাতন সোপানে আসিয়া উপবেশন করিল। এবার অনুপমা চালাক হইয়াছে। আরবার সন্তরণ শিক্ষাটা তাহাকে মরিতে দেয় নাই, এবার তাহা বিফল করিবার জন্য কাঁকে কলসী লইয়া আসিয়াছে। এবার পুষ্করিণীর কোথায়

ডুবন-জল আছে, তাহা বাহির করিয়া লইবে—এবার নিশ্চয় ডুবিয়া মরিবে! মরিবার পূর্ব্বে পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখায়। ঘর-বাড়ী, আকাশ, মেঘ, চন্দ্র, তারা, জল, ফুল, লতা, বৃক্ষ সব সুন্দর হইয়া উঠে; যে দিকে চাও, সেই দিকেই মনোরম বোধ হয়। সব যেন অঙ্গুলি তুলিয়া বলিতে থাকে, মরিও না, দেখ আমরা কত সুখে আছি—তুমিও সহ্য করিয়া থাক, একদিন সুখী হইবে। না হয় আমাদের কাছে এস, আমরা তোমাকে সুখী করিব; অনর্থক বিধাতৃ-দত্ত আত্মাকে নরকে নিক্ষেপ করিও না। মরিতে আসিয়াও মানুষ তাই অনেক সময়ে ফিরিয়া যায়। আবার যখন ফিরিয়া দেখে, জগতে তাহার একতিলও সুখ নাই, অসীম সংসারে দাঁড়াইবার এক বিন্দু স্থান নাই, আপনার বলিতে একজনও নাই, তখন আবার মরিতে চাহে, কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন ভিতর হইতে বলিতে থাকে, ছি ছি! ফিরিয়া যাও—এমন কাজ করিও না। মরিলেই কি সকল দুঃখের অবসান হইল? কেমন করিয়া জানিলে ইহা অপেক্ষা আরও গভীর দুঃখে পতিত হইবে না? মানুষ অমনি সঙ্কুচিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়ায়। অনুপমার কি এসব কথা মনে হইতেছিল না? কিন্তু অনুপমা তবুও মরিবে, কিছুতেই আর বাঁচিবে না।

পিতার কথা মনে হইল, মাতার কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনের কথা মনে হইল! যাহার কথা মনে হইল, সে ললিত। যাহারা তাহাকে ভালবাসিত, তাহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছে। শুধু একজন এখনও জীবিত আছে! সে ভালবাসিয়াছিল, ভালবাসা পাইতে আসিয়াছিল, হৃদয়ের দেবী বলিয়া পূজা দিতে আসিয়াছিল, অনুপমা সে পূজা গ্রহণ করে নাই; এবং অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। শুধু কি তাই? জেলে পর্য্যন্ত দিয়াছিল; ললিত সেখানে কত ক্লেশ পাইয়াছিল, হয়ত অনুপমাকে কত অভিসম্পাত করিয়াছিল, তাহার মনে হইল, নিশ্চিত

সেই পাপেই এত ক্লেশ, এত যন্ত্রণা। সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাল হইয়াছে, মদ ছাড়িয়াছে, দেশের উপকার করিয়া আবার যশ কিনিতেছে। সে কি আজও তাহাকে মনে করে? হয়ত করে না, হয়ত বা করে—কিন্তু তাহাতে কি? তাহার যে কলঙ্ক রটিয়াছে। তিনি কি তাহা শুনিয়াছেন? যখন গ্রামময় রটিবে যে আমি কলঙ্কিনী হইয়া ডুবিয়াছি, কাল যখন আমার দেহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, ছি ছি! কত ঘৃণায় তার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে।

অনুপমা অঞ্চল দিয়া গলদেশে কলসী বাঁধিল। এমন সময়ে কে একজন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, অনুপমা! অনুপমা চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল, একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক আবার ডাকিল। অনুপমার মনে হইল এ স্বর আর কোথাও শুনিয়াছে কিন্তু স্মরণ করিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

অনুপমা আত্মহত্যা ক'রো না।

অনুপমা কোনও কালেই ব্রীড়ানত লজ্জাবতী লতা নহে; সে সাহস করিয়া বলিল, আমি আত্মহত্যা করব, আপনি কি করে জানলেন?

তবে গলায় কলসী বেঁধেছ কেন? অনুপমা মৌন হইয়া রহিল। আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আত্মঘাতী হলে কি হয় জান?

কি?

অনন্ত নরক। অনুপমা শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কলসী খুলিয়া রাখিয়া বলিল, এ সংসারে স্থান নাই।

ভুলে গিয়েছ! আমি মনে করে দিচ্ছি। প্রায় ছবছর পূর্ব্বে ঠিক এই স্থানে একজন তোমাকে চিরজীবনের জন্য স্থান দিতে চেয়েছিল—স্মরণ হয়? অনুপমা লজ্জায় রক্তমুখী হইয়া বলিল, হয়।

এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

আমার কলঙ্ক রটেছে—আমার বাঁচা হয় না।

মরলেই কি কলঙ্ক যায় ?

যাক না যাক, আমি তা শুনতে যাব না।

ভুল বুঝেছ অনুপম ! মরলে এ কলঙ্ক চিরকাল ছায়ার মত তোমার নামের পাশে ঘুরে বেড়াবে। বেঁচে দেখ, এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হবে না।

কিন্তু কোথায় গিয়ে বেঁচে থাকব ?

আমার সঙ্গে চল।

অনুপমার একবার মনে হইল, তাহাই করিবে! চরণে লুটাইয়া পড়িবে, বলিবে, আমাকে ক্ষমা কর। বলিবে, তোমার অনেক অর্থ আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও—আমি গিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকি। পরে অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, আমি যাব না।

কথা শেষ হইতে না হইতে অনুপমা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

* * * *

অনুপমা জ্ঞান হইলে দেখিল, সুসজ্জিত হর্ম্যে পালঙ্কের উপর সে শয়ন করিয়া আছে, পার্শ্বে ললিতমোহন। অনুপমা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কাতর স্বরে বলিল, কেন আমাকে বাঁচালে ?

বাল্য-স্মৃতি

১

অন্ন-প্রাশনের সময় যখন আমাদের নামকরণ হয় তখন আমি ঠিক হইয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়াই হোক, আর ঠাকুর্দ্দা মহাশয়ের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ দখল না থাকাতেই হোক, আমি 'সুকুমার'। অধিক দিন নহে, ঠিক দুই-চারি বৎসরে ঠাকুর্দ্দা মহাশয় বুঝিলেন যে, নামটার সহিত আমার তেমন মিশ্ খায় না। এখন বার-তের বৎসর পরের কথা বলি। অবশ্য আমার আত্ম-পরিচয়ের কথা কেউ ভাল বুঝিতে পারিবে না—তবুও—

দেখুন, পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ী। সেখানে আমি ছেলে-বেলা হইতেই আছি। পিতা মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করিতেন। আমি বড় একটা সেখানে যাইতাম না। ঠাকুরমার নিকট দেশেই থাকিতাম। বাটিতে আমার উপদ্রবের সীমা ছিল না। এক কথায় একটি ক্ষুদ্র রাবণ ছিলাম। বৃদ্ধ ঠাকুরর্দ্দা যখন বলিতেন, তুই হ'লি কি? কারও কথা শুনিস্ নে। এইবার তোর বাপকে চিঠি লিখ্‌ব। আমি অল্প হাসিয়া বলিতাম, ঠাকুর্দ্দা সে দিন-কাল আর নেই, বাপের বাপকে আমি ভয় করি নে। ঠাকুরমা কাছে থাকিলে আর ভয় কি? ঠাকুর্দ্দাকে তিনিই বলিতেন, কেমন উত্তর দিয়েছে—আর লাগ্‌বে?

ঠাকুর্দ্দা মহাশয় যদি বড় বিরক্ত হইয়া আমার পিতাকে পত্র লিখিতেন, আমি তখনই তাঁর আফিমের কৌটা লুকাইয়া ফেলিতাম। পরে পত্রখানি না ছিঁড়িয়া ফেলিলে আর কৌটা বাহির করিতাম না। এই

সকল উপদ্রবের ভয়ে বিশেষতঃ মৌতাত সম্বন্ধে বিভ্রাট ঘটে দেখিয়া তিনি আমাকে আর কিছু বলিতেন না। আমিও বেশ ছিলাম।

হইলে কি হয়? সকল সুখেরই একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। আমারও তাহাই হইল। ঠাকুর্দ্দার খুড়তুত ভাই গোবিন্দবাবু বরাবর এলাহবাদে চাকরী করিতেন; এখন পেন্‌সন্‌ লইয়া তিনি দেশে আসিলেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বি-এ পাশ করিয়া তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁকে সেজদাদা বলি। পূর্ব্বে আমার সহিত তাঁহার বিশেষ জানা শুনা ছিল না। তিনি বড় একটা এ অঞ্চলে আসিতেন না; বিশেষতঃ তাঁদের আলাদা বাড়ী; আসিলেও আমার বিশেষ খোঁজ লইতেন না। কখনও দেখা হইলে—কি রে কেমন আছিস্‌? কি পড়িস্‌? এই পর্য্যন্ত।

এবার তিনি জাঁকিয়া আসিয়া দেশে বসিলেন। কাজে কাজেই আমার বিশেষ খোঁজ হইল। দুই-চারি দিবসের আলাপেই তিনি আমাকে এরূপ বশীভূত করিয়া ফেলিলেন যে তাঁহাকে দেখিলেই আমার ভয় হইত, মুখ শুকাইয়া যাইত, বুক্‌ ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিত—যেন কত দোষই করিয়াছি, কত শাস্তি পাইব। আর যথার্থ আমি তখন প্রায়ই দোষী থাকিতাম। সর্ব্বদা একটা না একটা অন্যায় করা আমার চাই। দুই-চারিটা অকর্ম্ম দুই-চারি বার উপদ্রব করা আমার নিত্যকর্ম্ম। ভয় করিলেও আমি দাদাকে বড় ভালবাসিতাম। ভাই ভাইকে যে এত ভালবাসিতে পারে, পূর্ব্বে আমি তাহা জানিতাম না। তিনিও আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁর কাছেও কত দোষ করিয়াছি, কিন্তু কিছু বলিতেন না; আর বলিলেও মনে করিতাম, সেজদাদা ত, একটু পরে আর কিছুই মনে থাকিবে না।

ইচ্ছা করিলে হয়ত তিনি আমার চরিত্র সংশোধন করিতে পারিতেন,

কিন্তু কিছুই করিলেন না। তাঁর দেশে আসাতে আমি পূর্ব্বের মত স্বাধীন নয় বটে, কিন্তু তথাপি যাহা আছি, বেশ আছি।

রোজ ঠাকুর্দ্দার এক পয়সার তামাক খাইয়া ফেলি। বুড়ো বেচারী আমার ভয়ে খাটের খুরোর পাশে, তক্তপোশের পেটের সিন্দুকে, চালার বাতায়, যেখানে তামাক রাখিতেন, আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া সবটুকু টানিয়া আনিয়া খাইয়া ফেলিতাম। খাই দাই ঘুড়ি ওড়াই, বেশ আছি। কোনও জঞ্জাল নাই; পড়া-শুনা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছি। পাখী মারিতাম, কাঠবেড়াল মারিয়া পোড়াইয়া খাইতাম, বনে বনে গর্ত্তে গর্ত্তে খরগোস খুঁজিয়া বেড়াইতাম, কোনও ভাবনা ছিল না।

বাবা বক্সারে চাকরী করিতেন। সে স্থান হইতে আমাকে দেখিতেও আসিতেন না; মারিতেও আসিতেন না। ঠাকুরমা ও ঠাকুর্দ্দার হাল পূর্ব্বেই বিবৃতি করিয়াছি। সুতরাং এক কথায় আমি বেশ ছিলাম।

একদিন দুপুর-বেলা বাড়ী আসিয়া ঠাকুরমার নিকট শুনিলাম, আমাকে সেজদার সহিত কলিকাতায় থাকিয়া পড়া-শুনা করিতে হইবে। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া এক ছিলিম তামাক হাতে করিয়া আসিয়া ঠাকুর্দ্দাকে বলিলাম, আমাকে কল্‌কাতায় যেতে হবে? ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, হাঁ। আমি পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, এ সকল ঠাকুর্দ্দার চালাকী। বলিলাম, যদি যেতে হয় আজই যাব! ঠাকুর্দ্দা হাসিয়া বলিলেন, সে জন্য চিন্তা কি দাদা? রজনী আজই কলকাতায় যাবে। বাসা ঠিক হয়ে গেছে আজই যেতে হবে। আমি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলাম। একে সেদিন ঠাকুর্দ্দার তামাক খুঁজিয়া পাই নাই—যে এক ছিলিম পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার একটান্‌ও হইবে না—তাহার উপর আবার এই কথা। ঠকিয়া গিয়াছি; নিজে নিমন্ত্রণ লইয়া আর ফিরান যায় না। কাজেই সেদিন আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। যাইবার

সময় ঠাকুর্দ্দাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম, হরি, কালই যেন তোমার শ্রাদ্ধে বাড়ী ফিরে আসি। তারপর আমাকে কে কলকাতায় পাঠায় দেখে নেব।

২

আমি এই প্রথম কলিকাতায় আসিলাম। এত বড় জমকাল সহর পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মনে ভাবিলাম, যদি এই প্রকাণ্ড গঙ্গার উপরের কাঠের সাঁকোর মাঝামাঝি, কিংবা ঐ যেখানে একরাশ মাস্তুল খাড়া করিয়া জাহাজগুলা দাঁড়াইয়া আছে, সেই বরাবর যদি একবার তলাইয়া যাই, তাহা হইলে আর কখনও বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিব না। কলিকাতায় আমার একটুও ভাল লাগিল না। এত ভয়ে কি আর ভালবাসা হয়? কখনও যে হইবে—সে ভরসাও করিতে পারিলাম না।

কোথায় গেল আমাদের সেই নদীর ধার, সেই বাঁশঝাড়, মাঠের মধ্যের বেল গাছ, মিত্তিরদের বাগানের এক কোণের জামরুল গাছ, কিছুই নাই। শুধু বড় বড় বাড়ী, বড় বড় গাড়ী ঘোড়া, আর লোকজনে ঠেসাঠেসি, পেশাপেশি, বড় বড় রাস্তা—বাড়ীর পিছনে এমন একটি বাগান নাই যে, লুকাইয়া এক ছিলিম তামাক খাই। আমার কান্না আসিল। চোখের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলাম, ভগবান জীবন দিয়েছেন—আহার তিনিই দেবেন। কলিকাতায়, স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, ভাল করিয়া পড়াশুনা করি, কাজে কাজেই আমি আজকাল ভাল ছেলে। দেশে অবশ্যই আমার নাম জাহির হইয়া গিয়াছে—যাক্ সে কথা।

আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব মিলিয়া একটা মেস করিয়া আছি। আমাদের মেসে চারিজন লোক। সেজদাদা, আমি, রামবাবু ও জগন্নাথ-

বাবু। রামবাবু ও জগন্নাথবাবু সেজদাদার বন্ধু। এতদ্ভিন্ন একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ আছে।

গদাধর আমাদের রসুয়ে ব্রাহ্মণ। সে আমা অপেক্ষা তিন-চারি বৎসরের বড় ছিল। অমন ভালমানুষ লোক আমি কখনও দেখি নাই। পাড়ার কোনও ছেলের সহিত আমার আলাপ ছিল না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইলেও সে আমার মস্ত বন্ধু হইয়া উঠিল। তাহাতে আমাতে যে কত গল্প হইত তাহার আর ঠিকানা ছিল না। তাহার বাড়ী মেদিনীপুর জেলার একটা গ্রামে। সেখানকার কথা, তাহার বাল্য-ইতিহাস ইত্যাদি শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত। সে সব কথা আমি এতবার শুনিয়াছি যে, আমার বোধ হয় আমাকে সেখানে চোখ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলেও সমস্ত স্থানটি স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি। রবিবারে তাহার সহিত আমি গড়ের মাঠে বেড়াইতে আসিতাম। সন্ধ্যা-বেলা রান্না-ঘরে বসিয়া খিল দিয়া দুইজনে বিস্তি খেলিতাম। ভাত খাইয়া তার ছোট হুঁকোটিতে দুইজনে তামুক খাইতাম। সব কাজ আমরা দুইজনে করিতাম। পাড়ার কাহারও সহিত আলাপ নাই; সঙ্গী, দোস্ত, ইয়ার, বন্ধু, মুচিপাড়ার ভুলো, কেলো, খোকা, খাঁদা সবই আমার সে; তাহার মুখে আমি কখনও উঁচু কথা শুনি নাই। মিছামিছি সবাই তাহাকে তিরস্কার করিত; আমার গা জ্বালা করিত, কিন্তু সে কোনও কথার উত্তর দিত না—যেন যথার্থ-ই দোষ করিয়াছে।

সকলকে আহার করাইয়া সে যখন রান্নাঘরের কোণে একটি ছোট থালায় খাইতে বসিত, তখন আমার শতকর্ম্ম থাকিলেও সেখানে উপস্থিত হইতাম। বেচারীর ভাগ্যে প্রায় কিছুই থাকিত না; এমন কি ভাত পর্য্যন্ত কম পড়িত। কাহারও খাইবার সময় আমি থাকি নাই—খাইতে বসিয়া ভাত কম পড়ে, তরকারী কম পড়ে, মাছ কম

পড়ে, আমি আগে কখনও দেখি নাই! আমার কেমন কেমন বোধ হইত!

ছেলে-বেলায় ঠাকুরমা মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিতেন, ছেলেটা আধপেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে—আর বাঁচবে না। আমি কিন্তু ঠাকুরমার ভোরপেট কিছুতেই খাইতে পারিতাম না। শুকাইয়াই যাই, আর দড়ি হইয়াই যাই, আমার আধপেটাই ভাল লাগিত। এখন কলিকাতায় আসিয়া বুঝিয়াছি, সে আধপেটায় এ আধপেটায় অনেক প্রভেদ। কেহ খাইতে না পাইলে যে চোখে জল আসিয়া পড়ে, আমি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই। পূর্ব্বে কতবার ঠাকুর্দ্দার পাত্রে উৎসৃষ্ট জল দিয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিই নাই; ঠাকুরমার গায়ে সারমেয় সন্তান নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উপস্থিত কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে বিরত করিয়াছি। তাঁহাদের আহার হয় নাই; কিন্তু চোখে কখনও জল আসে নাই। পিতামহ, পিতামহী, আপনার লোক—গুরুজন, আমাকে স্নেহ করেন—তাঁহাদের জন্য কখনও দুঃখ হয় নাই; স্বইচ্ছায় তাঁহাদিগকে অর্দ্ধভুক্ত, এমন কি অভুক্ত রাখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আর এই গদাধর কোথাকার কে—তাহার জন্য অনাহূত অশ্রু আপনি আসিয়া পড়ে।

কলিকাতায় আসিয়া যে আমার কি হইল, তাহা ঠাওরাইতে পারি না। চোখে এত জলই বা কোথা হইতে আসে, ভাবিয়া পাই না। আমাকে কেহ কাঁদিতে দেখে নাই। জিদ করিয়া আস্ত খেজুরের ছড়ি আমার পৃষ্ঠে ভগ্ন করিয়াও বাল্যকালে গুরুমহাশয় তাঁহার সাধ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ছেলেরা বলিত, সুকুমারের গা ঠিক পাথরের মত। আমি মনে মনে বলিতাম, গা পাথরের মত নয়—মন পাথরের মত। কচি খোকার মত কাঁদিয়া ফেলি না। বাস্তবিক কাঁদিতে আমার লজ্জা বোধ হইত, এখনও হয়; কিন্তু সামলাইতে পারি না।

লুকাইয়া কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, চোরের চুরি করার মত—দুবার চক্ষু মুছিয়া ফেলি। স্কুলে পড়িতে যাই, একপাল লোক ভিক্ষা করিতেছে। কাহারও হাত নাই, কাহারও পা নাই, কাহারও চক্ষু দুটি নাই, এমনই কত কি নাই ধরণের লোক দেখি ; তাহা আর বলিতে পারি না। তিলক কাটিয়া খঞ্জনী হাতে লইয়া "জয়-রাধে" বলিয়া ভিক্ষা করে, তাহাই জানি, এসব ভিখারী আবার কি রকমের ? মনের দুঃখে মনে মনেই বলিতাম, ঠাকুর! এদের আমাদের দেশে পাঠিয়ে দাও। যাক্ পোড়া ভিখারীর কথা—আমার কথা বলি। চক্ষু অনেকটা সড়গড় হইলেও আমি একেবারে বিদ্যাসাগর হইতে পারিলাম না। মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশের মা সরস্বতী যে কোথা হইতে আসিয়া আমার স্কন্ধদেশে ভর করিতেন, বলিতে পারি না। তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া যে সকল সৎকর্ম্ম করিয়া ফেলিতাম, তজ্জন্য এখনও আমার সে সরস্বতীর উপর ঘৃণা হইয়া আছে। বাসায় কাহার কি অনিষ্ট করিব, সর্ব্বদা খুঁজিয়া বেড়াইতাম। রামবাবু তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার দেশী কালাপেড়ে কাপড় কুঞ্চিত করিলেন ; বিকালে বেড়াইতে যাইবেন ; আমি অবসর বুঝিয়া কাপড়খানি খুলিয়া টানিয়া প্রায় সোজা করিয়া রাখিয়া দিলাম। তিনি বিকালে বস্ত্রখানির অবস্থা দেখিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমার আর আমোদ ধরে না। জগন্নাথবাবুর অফিসের বেলা হইয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি আহার করিতে বসিয়াছেন, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিতেছে না। আমি সময় বুঝিয়া তাঁহার চাপকানের বোতামগুলি সমস্ত কাটিয়া লইলাম। স্কুল যাইবার সময় একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেলাম, জগনাথবাবু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার উপক্রম করিতেছেন। মনের আনন্দে আমি সমস্ত পথ হাসিতে হাসিতে চলিলাম। সন্ধ্যার সময় জগন্নাথবাবু আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমার চাপকানের বোতামগুলো গদা বেটা চুরি করে বেচে ফেলেছে—বেটাকে

তাড়িয়ে দাও। জগন্নাথবাবুর চাপকানের বিবরণে দাদা ও রামবাবু উভয়েই মুখ টিপিয়া হাসিলেন। সেজদাদা বলিলেন, কত রকমের চোর আছে, কিন্তু চাপকানের বোতাম চুরি করে বেচে ফেল্‌তে কখনও শুনিনি। জগন্নাথবাবু এ কথায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, বেটা বোতামগুলো সকালে নিলে না, বিকালে নিলে না, রাত্রে নিলে না, ঠিক আফিস যাবার আগেই নিয়েছে। আজ দুর্গতির একশেষ ক'রেছে, একটা কালো ছেঁড়া পিরাণ গায়ে দিয়ে আমায় আফিস যেতে হয়েছে।

সকলেই হাসিলেন। জগন্নাথবাবুও হাসিলেন। কিন্তু আমি হাসিতে পারিলাম না। মনে ভয় হইল, পাছে গদাধরকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সে যে নির্ব্বোধ, হয়ত কোনও কথা বলিবে না, সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধে স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইবে।

কে বোতাম লইয়াছে, সেজদাদা হয়ত বুঝিয়াছিলেন। গরীব গদাধরের উপর কোনও জুলুম হইল না। কিন্তু আমিও সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখনও এমন কর্ম্ম করিয়া অন্যকে বিপন্ন করিব না।

এরূপ প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ব্বে কখনও করি নাই; কখনও করিতাম কি না, জানি না; শুধু গদাধর আমাকে একেবারে মাটী করিয়া দিয়াছে।

কি উপায়ে কাহার যে চরিত্র সংশোধিত হইয়া যায়, কেহই জানে না। গুরুমহাশয়ের, ঠাকুর্দ্দা মহাশয়ের আরও অনেক মহাশয়ের কত চেষ্টাতেও আমি যে প্রতিজ্ঞা কখনও করি নাই, এক গদাধর ঠাকুরের মুখ মনে করিয়া আজ সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম। এত দিনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে কি না, জানি না; কিন্তু স্বেচ্ছায় কখনও ভঙ্গ করিয়াছি এমন মনে হয় না।

এখন আর একজন লোকের কথা বলি। সে আমাদের রামা চাকর। রামা জাতে কায়েত কি সৎগোপ, এমনই কি একটা ছিল। বাড়ী কোথায়,

শুনি নাই—এত হুঁসিয়ার চটপটে চাকর সর্ব্বদা দেখা যায় না। আর যদি কখনও দেখা হয়, ইচ্ছা আছে, তাহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।

সকল কর্ম্মে রামাকে চরকীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতাম। এই রাম কাপড় কাচিতেছে; তখনই দেখি সেজদাদা স্নানে বসিয়াছেন, সে গা রগড়াইয়া দিতেছে; পরক্ষণেই দেখি সে পান সুপারি লইয়া মহা ব্যস্ত! এইরূপে সে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়ায়। সেজদার "The favourite!" মস্ত লোক! আমি কিন্তু তাহাকে দেখিতে পারিতাম না। সে বেটার জন্য আমি সেজদার নিকট প্রায়ই তিরস্কৃত হইতাম। বিশেষতঃ গদা বেচারীকে সে সর্ব্বদাই অপ্রস্তুত করিত। আমি তাহার উপর বড় চটা ছিলাম। কিন্তু হইলে কি হয়, সে সেজদার "The favourite!" আমাদের বাসার রামবাবুও তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "The rouge!" তখন এ কথাটার ব্যাখ্যা তিনি নিজে না করিতে পারিলেও, আমরা দুজনে বিলক্ষণ বুঝিতাম, রামা "The rouge!" তাঁহার চটিবার আরও অনেক কারণ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, সে নিজেকে রামবাবু বলিয়া পরিচয় করিত। সেজদাদাও সময়ে সময়ে রামবাবু বলিয়া ডাকিতেন। আমাদের রামবাবুর এসব ভাল লাগিত না। যাক বাজে কথা—

একদিন বিকালে সেজদাদা একটা ল্যাম্প ক্রয় করিয়া আনিলেন। বড় ভাল জিনিস, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা মূল্য। সকালে বেড়াইতে যাইলে আমি গদাধরকে ডাকিয়া আনিয়া সেটা দেখাইলাম। গদাধর সে রকম আলো কখনও দেখে নাই। সে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেটা দুই-চারিবার নাড়িয়া দেখিল; তাহার পর আপনার কর্ম্মে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। আমার কিন্তু কৌতূহল কিছুতেই থামিল না। কি করিয়া চিমনী খুলি! কি করিয়া ভিতরের কল দেখি! অনেক নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম,

অনেকবার ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই খুলিল না। পরে দেখিলাম, নীচে একটা ইস্ক্রু আছে, অগত্যা সেটা ঘুরাইলাম। কিছুক্ষণ ঘুরাইবার পর হঠাৎ একেবারে ল্যাম্ফের আধখানা খসিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ভাল ধরিতে পারিলাম না, উপরের কাঁচগুলা টেবিল হইতে নীচে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল।

৩

সে দিন অনেক রাত্রে আমি বেড়াইয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড হৈচৈ কাণ্ড বাধিয়া উঠিয়াছে। গদাধরকে মাঝখানে লইয়া সকলে গোল হইয়া বসিয়াছেন। মেজদাদা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। গদাধরের জেরা চলিতেছে।

গদাধরের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। বলিতেছে, বাবু, আমি ওটা ছুঁয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাঙ্গিনি, সুকুমারবাবু আমাকে দেখালেন—আমিও দেখ্‌লাম। তার পর তিনিও বেড়াতে গেলেন, আমিও রাঁধতে গেলাম।

কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। সাব্যস্ত হইয়া গেল, সে-ই চিমনী ভাঙ্গিয়াছে। তাহার মাহিনা বাকি ছিল; সেই টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা দিয়া আবার নূতন চিমনী আসিল। সন্ধ্যার সময় যখন আলো জ্বলিল, তখন সকলেই বেশ প্রফুল্ল হইল, শুধু আমার চক্ষু দুটো জ্বালা করিতে লাগিল। সর্ব্বদা মনে হইতে লাগিল, তাহার সাড়ে তিন টাকা চুরি করিয়া লইয়াছি। আর থাকিতে পারিলাম না। কাঁদিয়া কোনও মতে সেজদাদার মত করিয়া বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম, ঠাকুরমার নিকট হইতে টাকা আনিয়া

গোপনে সাড়ে তিন টাকার পরিবর্ত্তে গদাধরকে সাত টাকা দিব। আমার নিজের কাছে তখন টাকা ছিল না। সব টাকা সেজদাদার নিকট ছিল। কাজেই টাকা আনিতে আমাকে দেশে আসিতে হইল। মনে করিয়া আসিয়াছিলাম এক দিনের অধিক থাকিব না। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সাত-আট দিন দেশে কাটিয়া গেল।

সাত-আট দিন পরে আবার কলিকাতার বাসায় ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই ডাকিলাম, গদা! কেহ উত্তর দিল না। আবার ডাকিলাম, গদাধর ঠাকুর! কোনও উত্তর নাই! গদা! এবার রামচরণ আসিয়া বলিল, ছোটবাবু, কখন এলেন?

এই আসছি—ঠাকুর কোথায়?

ঠাকুর—নেই।

কোথায় গেছে?

বাবু তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

তাড়িয়ে দিয়েছেন? কেন?

চুরি ক'রেছিল বলে।

প্রথমে আমি কথাটা ভাল বুঝিতে পারি নাই, তাই কিছুক্ষণ রামার মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম। রামা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু টিপিয়া হাসিয়া বলিল, ছোটবাবু আশ্চর্য্য হচ্ছেন, কিন্তু তাকে ত আপনারা চিন্‌তেন না। তাই অত ভালবাস্‌তেন। সে মিট্‌-মিটে ডান ছিল; ভিজে বেড়ালকে আমি চিন্‌তাম।

কিসে সে মিট্‌-মিটে ডাইন ছিল, কিংবা কেন যে সেই সিক্ত মার্জ্জারকে চিনিতে পারি নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কার টাকা চুরি করেছে?

সেজবাবুর।

কোথায় ছিল ?

জামার পকেটে।

কত টাকা ?

চার টাকা।

কে দেখেছে ?

চোখ দিয়ে কেউ দেখে নি বটে, কিন্তু সে একরকম দেখাই।

কেন ?

সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করতে হয় ? আপনি বাসায় ছিলেন না; রামবাবু নিলেন না; জগন্নাথবাবু নিলেন না; আমি নিলাম না। তবে নিলে কে ? কোথায় গেল ?

তুই তবে তাকে ধরেছিস্ ?

রাম হাসিয়া বলিল, না হ'লে আর কে ?

ঠন্‌ঠনের চটী জুতা আপনারা স্বচ্ছন্দে কিনিতে পারেন। তেমন মজবুত চটী বোধ হয় আর কোথাও প্রস্তুত হয় না।

আমি রন্ধনশালায় গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সেই ছোট কলি হুঁকাটিতে ধূলা পড়িয়া রহিয়াছে। আজ চারি-পাঁচ দিন তাহা কেহ স্পর্শ করে নাই; কেহ জল বদলায় নাই। দেয়ালে একস্থানে কয়লায় লেখা রহিয়াছে, সুকুমারবাবু, আমি চুরি করিয়াছি। এ স্থান হইতে চলিলাম। বাঁচিয়া থাকি আবার আসিব।

আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। নিতান্ত ছেলে-বুদ্ধিতে সেই হুঁকাটিকে বুকে টিপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন যে, তাহার কারণ বুঝিতে পারি নাই।

আমার আর সে বাসাতে মন টিকিত না। সন্ধ্যার সময় ঘুরিয়া ফিরিয়া একবার করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতাম। আর একজন

রাঁধিতেছে দেখিয়া অন্যমনে আপনার ঘরে আসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে বসিতাম। সময়ে সময়ে আমার সেজদাদাকেও দেখিতে পাইতাম না। ভাত পর্য্যন্ত আমার তিক্ত বোধ হইত। অনেক দিন পরে একদিন রাত্রে সেজদাদাকে বলিলাম, সেজদা! কি করেছ?

কিসের কি করেছি?

গদা তোমার টাকা কখনও চুরি করে নি। সকলেই জানিত আমি গদা ঠাকুরকে বড় ভালবাসিতাম। সেজদাদা বলিলেন, ভাল করি নি সুকুমার। যা হবার হয়েছে, কিন্তু রামকে তুই অত মেরেছিলি কেন?

বেশ করেছিলাম। আমাকেও কি তাড়াবে নাকি?

দাদা আমার মুখে কখনও অমন কথা শোনেন নি। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কত টাকা উসুল হয়েছে? দাদা বড় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ভাল করি নি। সব টাকা তার কেটে নিয়ে আড়াই টাকা উসুল করেছিলাম। আমার এতটা ইচ্ছে ছিল না।

আমি যখন রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম, দূরে যদি কোনও লোক ময়লা চাদর কাঁধে ফেলিয়া ছেঁড়া চটিজুতা পায়ে চলিয়া যাইত, আমি দৌড়াইয়া গিয়া দেখিয়া আসিতাম। কি যে একটা আশা নিত্য নিত্য নিরাশায় পরিণত হইত, তাহা আর কি বলিব?

প্রায় পাঁচ মাস পরে দাদার নামে একটা মণিঅর্ডার আসিল। দেড় টাকার মণিঅর্ডার। দাদাকে আমি সেই দিন চোখের জল মুছিতে দেখি। সে কুপনটা এখনও আমার নিকট রহিয়াছে।

কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজও সেই গরীব গদাধর ঠাকুর আমার বুকের আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছে।

হরিচরণ

"—"সে আজ অনেক দিনের কথা। প্রায় দশ-বার বৎসরের কথা। তখন দুর্গাদাসবাবু উকীল হন নাই! দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি বোধ হয় ভাল চেন না, আমি বেশ চিনি! এস, তাঁহাকে আজ পরিচিত করিয়া দিই।

ছেলে-বেলায় কোথা হইতে এক অনাথ পিতৃমাতৃহীন কায়স্থ বালক রামদাসবাবুর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সকলেই বলিত, ছেলেটী বড় ভাল। বেশ সুন্দর বুদ্ধিমান চাকর, দুর্গাদাসবাবুর পিতার বড় স্নেহের ভৃত্য।

সব কাজ-কর্ম্মই সে নিজে টানিয়া লয়। গরুর জাব দেওয়া হইতে বাবুকে তেল মাখান পর্য্যন্ত সমস্তই সে নিজে করিতে চাহে। সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে বড় ভালবাসে।

ছেলেটির নাম হরিচরণ। গৃহিণী প্রায়ই হরিচরণের কাজ-কর্ম্মে বিস্মিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও করিতেন, বলিতেন, হরি—অন্য অন্য চাকর আছে; তুই ছেলেমানুষ, এত খাটিস্ কেন? হরির দোষের মধ্যে ছিল সে বড় হাসিতে ভালবাসিত। হাসিয়া উত্তর করিত, মা, আমরা গরীব লোক, চিরকাল খাট্‌তেই হবে, আর ব'সে থেকেই বা কি হবে?

এইরূপ কাজ-কর্ম্মে, সুখে, স্নেহের ক্রোড়ে হরিচরণের প্রায় এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল।

* * * *

সুরো রামদাসবাবুর ছোট মেয়ে। সুরোর বয়স এখন প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর। হরিচরণের সহিত সুরোর বড় আত্মীয় ভাব দেখা যাইত। যখন

দুগ্ধ-পানের নিমিত্ত গৃহিণীর সহিত সুরো দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিত, যখন মা অনেক অযথা বচসা করিয়াও এই ক্ষুদ্র কন্যাটিকে স্বমতে আনিতে পারিতেন না এবং দুগ্ধ-পানের বিশেষ আবশ্যকতা ও তাহার অভাবে কন্যারত্নের আশু প্রাণবিয়োগের আশঙ্কায় শঙ্কান্বিত হইয়া বিষম ক্রোধে সুরবালার গণ্ডদ্বয় বিশেষ টিপিয়া ধরিয়াও তাহাকে দুধ খাওয়াইতে পারিতেন না, তখনও হরিদাসের কথায় অনেক ফল লাভ হইত।

যাক্, অনেক বাজে কথা বকিয়া ফেলিলাম। আসল কথাটা এখন বলি, শোন। না হয় সুরো হরিদাসকে ভালবাসিত।

দুর্গাদাসবাবুর যখন কুড়ি বৎসর বয়স, তখনকার কথাই বলিতেছি। দুর্গাদাস এতদিন কলিকাতাতেই পড়িত। বাড়ী আসিতে হইলে ষ্টীমারে দক্ষিণ দিকে যাইতে হইত, তাহার পরেও প্রায় হাঁটা পথে দশ-বার ক্রোশ আসিতে হইত, সুতরাং পথটা বড় সহজগম্য ছিল না। এই জন্যই দুর্গাদাসবাবু বড় একটা বাড়ী যাইতেন না।

ছেলে বি-এ পাশ হইয়া বাড়ী আসিয়াছে। মাতাঠাকুরাণী অতিশয় ব্যস্ত। ছেলেকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে দাওয়াইতে যত্ন আত্মীয়তা করিতে যেন বাটী-শুদ্ধ সকলেই একসঙ্গে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গাদাস জিজ্ঞাসা করিল, মা, এ ছেলেটি কে গা? মা বলিলেন, এটি একজন কায়েতের ছেলে; বাপ-মা নেই, তাই কর্ত্তা ওকে নিজে রেখেছেন। চাকরের কাজ-কর্ম্ম সমস্তই করে আর বড় শান্ত; কোন কথাতেই রাগ করে না। আহা! বাপ-মা নেই—তাতে ছেলেমানুষ—আমি বড় ভালবাসি।

বাড়ী আসিয়া দুর্গাদাসবাবু হরিচরণের এই পরিচয় পাইলেন।

যাহা হৌক, আজকাল হরিচরণের অনেক কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট নহে। ছোটবাবুকে (দুর্গাদাসকে) স্নান

করান, দরকার মত জলের গাড়ু, ঠিকসময়ে পানের ডিবে, উপযুক্ত অবসরে হুঁকা ইত্যাদি যোগাড় করিয়া রাখিতে হরিচরণ বেশ পটু। দুর্গাদাস-বাবুও প্রায় ভাবেন, ছেলেটি বেশ inteligent! সুতরাং কাপড় কোঁচান তামাক সাজা প্রভৃতি কর্ম্ম হরিচরণ না করিলে দুর্গাদাসবাবুর পছন্দ হয় না।

* * * * *

কিছু বুঝি না, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। মনে আছে কি? একবার দুজনে কাঁদিতে কাঁদিতে পড়ি বড়ই দুরূহ তত্ত্ব। আমার বোধ হয় সব কথাতেই এটা খাটে। দেখেছ কি—ভাল থেকে কেবল ভালই দাঁড়ায়, মন্দ কি কখনও আসিয়া দাঁড়ায় না? যদি না দেখিয়া থাক তবে এস আজ তোমাকে দেখাই বড়ই দুরূহ তত্ত্ব।

উপরি উক্ত কথা কয়টি সকলের বুঝিতে পারা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই, আর আমারও Philosphy নিয়ে deal করা উদ্দেশ্য নহে; তবুও আপোষে দুটো কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি কি?

আজ দুর্গাদাসবাবুর একটা জাঁকাল ভোজের নিমন্ত্রণ আছে। বাড়ীতে খাইবে না, সম্ভবতঃ অনেক রাত্রে ফিরিবেন। এই সব কারণে হরিচরণকে প্রাত্যহিক কর্ম্ম সারিয়া রাখিয়া শয়ন করিতে বলিয়া গেছেন।

এখন হরিচরণের কথা বলি। দুর্গাদাসবাবু বাহিরে বসিবার ঘরেই রাত্রে শয়ন করিতেন। তাহার কারণ অনেকেই অবগত নহে। আমার বোধ হয় গৃহিণী বাপের বাড়ীতে থাকায়, বাহিরের ঘরে শয়ন করাই তাহার অধিক মনোনীত ছিল।

রাত্রে দুর্গাদাসবাবুর শয্যা রচনা করা, তিনি শয়ন করিলে তাঁহার পদসেবা ইত্যাদি কাজ হরিচরণের ছিল। পরে বাবুর রীতিমত নিদ্রাকর্ষণ হইলে হরিচরণ পাশের একটি ঘরে শুইতে যাইত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই হরিচরণের মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল।

হরিচরণ বুঝিল, জ্বর আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। মধ্যে মধ্যে তাহার প্রায়ই জ্বর হইত; সুতরাং এ সব লক্ষণ তাহার বিশেষ জানা ছিল। হরিচরণ আর বসিতে পারিল না; ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোটবাবুর যে বিছানা প্রস্তুত হইল না, একথা আর মনে রহিল না। রাত্রে সকলেই আহারাদি করিল; কিন্তু হরিচরণ আসিল না। গৃহিণী দেখিতে আসিলেন। হরিচরণ ঘুমাইয়া আছে; গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, গা বড় গরম। বুঝিলেন জ্বর হইয়াছে; সুতরাং আর বিরক্ত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। ভোজ শেষ করিয়া দুর্গাদাসবাবু বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, শয্যা প্রস্তুত হয় নাই। একে ঘুমের ঘোর, তাহাতে আবার সমস্ত পথ কি করিয়া বাড়ী যাইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িবেন, আর হরিচরণ শ্রান্ত পদযুগলকে বিনামা হইতে বিমুক্ত করিয়া অল্প অল্প টিপিয়া দিতে থাকিবে এবং সেই সুখে অল্প তন্দ্রার ঝোঁকে গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া একেবারে প্রভাত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন।

একেবারে হতাশ হইয়া বিষম জ্বলিয়া উঠিলেন, মহা ক্রুদ্ধ হইয়া দুই-চারি বার হরিচরণ, হরি, হরে—ইত্যাদি রবে চীৎকার করিলেন। কিন্তু কোথায় হরি? সে জ্বরের প্রকোপে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে। তখন দুর্গাদাসবাবু ভাবিলেন, বেটা ঘুমাইয়াছে; ঘরে গিয়া দেখিলেন, বেশ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

আর সহ্য হইল না। ভয়ানক জোরে হরির চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হরি ঢলিয়া বিছানার উপর পুনর্ব্বার শুইয়া পড়িল। তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গাদাসবাবু হিতাহিত বিস্মৃত হইলেন—তাহার পিটে সবুট পদাঘাত করিলেন! সে ভীম প্রহারে